# ঝিমঝিম

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

# সূচিপত্র

১৭ শ্রাবণ ।......................................................................................3
১৮ই শ্রাবণ ।...................................................................................31
১৯ শ্রাবণ ।....................................................................................56
২০ শ্রাবণ ।...................................................................................78
২১ শ্রাবণ ।....................................................................................96
২৭ শ্রাবণ ।..................................................................................106
৬ ভাদ্র ।......................................................................................117
৭ ভাদ্র ।......................................................................................121
১৫ ভাদ্র ।....................................................................................152
৮ আশ্বিন ।..................................................................................172
৩ কার্তিক ।.................................................................................180
৭ কার্তিক ।.................................................................................182
২৩ কার্তিক ।...............................................................................196

২৪ কার্তিক । ..................................................................................201

# ১৭ শ্রাবণ।

আজ আমার জন্মদিন। জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়ে ছাব্বিশ বছরে পা দিলুম। শতাব্দীর সিকি ভাগ কেটে গেল। কী পেলুম? কী দিলুম?

বাইরে ঘনঘোর বর্ষা নেমেছে। ঝরঝর ঝমঝম একটানা বৃষ্টি। রাত্রি এখন দশটা, এরই মধ্যে কলকাতা শহর নিঝুম হয়ে পড়েছে। রাস্তায় লোক নেই, গাড়ি চলাচল নেই, কেবল রাস্তার ধারের আলোগুলো নিজের নিজের মাথার চারপাশে জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার জন্মদিনে প্রতি বছর বৃষ্টি হয়। ভরা শ্রাবণ মাসে যার জন্ম তার জন্মদিনে বৃষ্টি হলে আশ্চর্য কিছু নেই। কিন্তু আমার জীবনে এমন একটা জন্মদিন আসেনি যেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়েনি। বাবা বলতেন, আমি যেদিন জন্মেছিলুম সেদিনও নাকি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়েছিল। মা আমার নাম দিয়েছিলেনবাদল। যতদিন বেঁচে ছিলেন আমাকে বাদল বলেই ডাকতেন। আমার মা! তিনি আজ কোথায়! আর আমার বাবা—তিনিও চলে গেছেন। আমাকে আর বাদল বলে ডাকবার কেউ নেই। এখন আমি মিস্ প্রিয়ংবদা ভৌমিক।

কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে প্রিয়ংবদা ভৌমিক ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেছে কেন? যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, অনেক দেখেছেন, অনেক আজ করেছেন, তাঁরা নিজের জীবনচরিত বা ডায়েরি লিখলে শোভা পায়। কিন্তু প্রিয়ংবদা ভৌমিক সামান্য একজন নার্স, সে ডায়েরি লেখে কোন্ স্পর্ধায়? কী আছে তার জীবনে? রোগীর শুশ্রুষা করা তার জীবিকা; রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো, টেম্পারেচার নেওয়া, রাত জেগে পাহারা দেওয়া, এই তার কাজ। তবে সে ডায়েরি লেখে কেন?

এর উত্তর খুব জোরালো নয়, তবু একটা উত্তর আছে। আমি কাজের সময় মন দিয়ে কাজ করি, মনটা কাজেই লিপ্ত থাকে। কিন্তু কাজ যখন থাকে না তখন মনটাকে নিয়ে কী করব ভেবে পাই না। আমার বন্ধু শুক্লাও আমার মত নার্স; আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি। কিন্তু দুজনে একসঙ্গে ছুটি পাওয়া ঘটে ওঠে না। তাছাড়া তার—তার মনের যাহোক একটা আশ্রয় আছে; আমার কিছুই নেই। দৈবাৎ যখন দুজনে একত্র হতে পারি তখন খুব গল্প করি। কিন্তু সে কতটুকু? বেশীর ভাগ সময় মনটা খালি পড়ে থাকে। তাই ঠিক করেছি ডায়েরি লিখব। নাই বা পড়ল কেউ; আমি নিজের মনের সঙ্গে কথা বলব। তবু তো একটা কিছু করা হবে।

ডায়েরির আরম্ভে নিজের জীবনের গোড়ার কথাগুলো লিখে রাখি। আমি কে সেটাও তো নিজেকে জানিয়ে রাখা দরকার।

জন্মেছিলুম পূর্ববঙ্গে; জীবনের প্রথম যোলটা বছর সেখানেই কেটেছে। বাবা ছিলেন কবিরাজ, খুব পসার ছিল। মা মারা যান যখন আমার বয়স পাঁচ বছর। বাবা আর বিয়ে

করেননি। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান; বাবা আমাকে নিজের হাতে মানুষ করেছিলেন। লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম।

ম্যাট্রিক পাস করবার কিছুদিন পরে হঠাৎ আমরা কলকাতায় চলে এলুম। তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়নি। কিন্তু বাবা বুঝতে পেরেছিলেন প্রচণ্ড দুর্যোগ আসছে। তিনি বাড়ি-ঘর বিক্রি করে সঞ্চিত টাকাকড়ি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। তার কয়েকমাস পরেই দুরন্ত কালবোশেখী ঝড়ের মত মহাদুযোগ এসে পড়ল; দেশ দুভাগ হবার সুত্রপাত হল। সেই সময় এই কলকাতার রাস্তাঘাটে যে বর্বরতা দেখেছি তা ভোলবার নয়।

বাবা এখানে এসে আবার কবিরাজী ব্যবসা খুলে বসেছিলেন, কিন্তু আর পসার হল না। পুঁজি ভেঙে সংসার চলতে লাগল। বাবা ভারি বিচক্ষণ ছিলেন, দূরদর্শী ছিলেন, তিনি আমাকে কলেজে ভর্তি করলেন না, বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পুঁজি ফুরোবার আগে যদি আমার একটা সদগতি করতে পারেন তাহলে তাঁর একলার জীবন কোনওরকমে কেটে যাবে।

যোগ্য ঘরবর কিন্তু জুটল না আমি সুন্দরী না হতে পারি, কিন্তু একেবারে স্যাওড়াগাছের পেত্নীও নই। রঙ ফরসা, মুখ চোখ গড়ন কোনওটাই নিন্দের নয়। তাছাড়া বাবা টাকা খরচ করতে রাজী ছিলেন। তবু আমাকে বিয়ে করতে কেউ এগিয়ে এল না। তার কারণ, আমার একটা মারাত্মক দোষ ছিল; আমি পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে। তখনকার দিনে পূর্ববঙ্গ থেকে যে-মেয়ে পালিয়ে এসেছে তার দৈহিক শুচিতা সম্বন্ধে

সকলের মনেই সন্দেহ। আমি যে দাঙ্গা আরম্ভ হবার আগেই পালিয়ে এসেছিলাম, একথায় কোনও বরকতাই কান দিলেন না।

কলকাতায় আসার পর বাবার শরীর আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করেছিল। ছিলেন রোজগেরে মানুষ, এখানে এসে রোজগার নেই। তার ওপর আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কলকাতার জলহাওয়াও তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অসুখে পড়েন, আমি সেবা-শুশ্রুষা করি। তিনি সেরে ওঠেন, আবার কিছুদিন পরে অসুখে পড়েন। এইভাবে বস্ত্র দেড়েক কেটে গেল।

একদিন বাবা অম্বলের ব্যথা নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমি পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম। তিনি একবার বালিশ থেকে মাথা তুলে আমার পানে তাকালেন, আস্তে আস্তে বললেন, তুই বেশ সেবা করতে পারিস। নার্সের কাজ শিখবি? এই বলে যেন একটু লজ্জিতভাবে আবার বালিশে মাথা রাখলেন।

বুঝতে পারলুম, রোগের মধ্যেও তিনি আমার কথাই ভাবছেন। হয়তো রোগের মধ্যে নিজের মৃত্যু-চিন্তা মনে এসেছে; ভাবছেন তিনি যদি হঠাৎ মারা যান তখন আমার কী গতি হবে। তাঁর মেয়ে নার্স হবে এ চিন্তা তাঁর কাছে সুখের নয়। কিন্তু উপায় কী? ভাল ঘরেবরে যখন বিয়ে দিতে পারলেন না তখন একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে তো, যাতে আমি ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পারি।

তাঁর প্রশ্নে আমার চোখে জল এল। কান্না চেপে বললুম, হ্যাঁ বাবা, শিখব। সেবা করতে আমার খুব ভাল লাগে।

বাবা নিশ্বাস ফেলে বললেন, সেই ভাল। সেরে উঠি, তারপর চেষ্টা করব। একটু থেমে আবার বললেন, নার্সের কাজ খুব ভাল কাজ। মানুষের সেবা, রুগ্ন মানুষের সেবা; এর তুল্য কাজ আছে! কিন্তু তাঁর কথায় খুব জোর পৌঁছল না।

মাসখানেক পরে পোবেশনার নার্স হয়ে নার্সদের কোয়ার্টারে উঠে এলুম। তিন বছরের কোর্স, তিন বছর পরে পাকা নার্স হয়ে বেরুব। নার্সদের হস্টেলে একটি ঘর পেলুম। আমাদের ওপর নিয়মের খুব কড়াকড়ি, সব কাজ কাঁটা ধরে হয়। কাজের সময় ছাড়া নার্সরা ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে পারে না। হপ্তায় এক বেলা ছুটি। আমি ছুটির এক বেলা বাড়ি যেতুম, বাবার কাছে তিন-চার ঘণ্টা থেকে আবার হস্টেলে ফিরে আসতুম।

হস্টেলে শুক্লার সঙ্গে ভাব হল। সে আমার চেয়ে এক বছরের সীনিয়র। দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু মুখখানি ভারি মিষ্টি আর মমতা-ভরা। এত মমতা নিয়েও জন্মেছিল পোড়ারমুখী, নিজের জীবনটা ভাসিয়ে দিলে।

হস্টেলে অনেক গোবেশনার মেয়ে ছিল, একজন টিউটর সিস্টার ছিলেন। আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে দাঁড়াল শুক্লা। লিখতে লজ্জা করে, কিন্তু এমন সময় এল যখন আমার মনে শুক্লা আমার বাবার চেয়েও বেশী জায়গা জুড়ে বসল। কেন এমন হয় কে জানে! হয়তো যৌবনে মানুষ চায় সমবয়সী মানুষের সঙ্গ। বুড়োরাও কি তাই চায়?

কী জানি! বাবাকে লক্ষ্য করেছি তাঁর কোনও সমবয়স্ক বন্ধু ছিল না; দু-চারজন পরিচিত লোক ছিল। সারা হপ্তা তিনি আমার পথ চেয়ে থাকতেন; যেন আমার জন্যই বেঁচে ছিলেন। তাঁর ভালবাসার কথা যখন ভাবি, নিজেকে বড় অকৃতজ্ঞ আর হৃদয়হীন মনে হয়। তাঁর স্নেহের কী প্রতিদান দিয়েছি আমি?

দিন কাটছে। হস্টেলে থাকি, ক্লাসে লেকচার শুনি, হাসপাতালে কাজ শিখি। রাত্তিরে যখন হস্টেলের আলো নিভে যায় তখন শুক্লা চুপিচুপি আমার ঘরে আসে, নয়তো আমি শুক্লার ঘরে যাই। দুজনে মুখোমুখি বিছানায় শুয়ে ফিসফিস করে গল্প করি। কি মাথামুণ্ডু গল্প করি তা জানি না। কোনও দিন গল্প করতে করতে রাত বারোটা বেজে যায়।

হাসপাতালে যখন কাজ করতে যাই, অনেক ছাত্র এবং ডাক্তারের সঙ্গে কাজ করতে হয়। তাছাড়া রোগী তো আছেই। রোগীরা বেশীর ভাগ গরিব বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কী অবস্থায় পড়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তাই ভেবে আমার বড় কষ্ট হত। ডাক্তারেরা বেশীর ভাগই তাড়াহুড়ো করে রোগী দেখে চলে যেতেন। ছাত্রেরা বেশ মন দিয়ে দেখত; কিন্তু তাদেরও ছিল নির্লিপ্ত ভাব। তারা যেন রোগটাকেই দেখত, রোগীকে দেখত না।

ছাত্রেরা ইউনিফর্ম-পরা নার্সদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে, কিন্তু নার্সদের যেন মানুষ বলে লক্ষ্য করে না। আমরা যেন কলের পুতুল। দুএকজন লক্ষ্য করে। তাদের চোখ ভোমরার মত এক নার্সের মুখ থেকে আর-এক নার্সের মুখে ঘুরে বেড়ায়, মধুর সন্ধান

করে। এরা যেন কলার ব্যাপারী, রথের মেলায় কলা বেচতে এসেছে। রথ দেখা কলা বেচা দুই কাজ একসঙ্গে করে।

একটি ছাত্র ছিল, তার নাম মন্মথ কর। পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, শুনেছিম ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। লম্বা মানানসই গড়নের চেহারা, চটপটে স্বভাব; অন্য ছেলের যে কথা বুঝতে দশ মিনিট সময় লাগত, সে তা এক মিনিটে বুঝে নিত। তার চোখের দৃষ্টি ছিল আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে একটু হাসত।

আমার তখন যে বয়স সেবয়সের মেয়েরা মনে মনে কল্পনার জাল বুনতে আরম্ভ করে। মন্মথ কর ভাল ছাত্র, তার চেহারা ভাল; সে আমার মত একজন প্রেবেশনার নার্সের পানে চেয়ে মুখ টিপে হাসে কেন? আমার মন আমাকে তার পানে টানতে থাকে। তার ওপর চোখ পড়লে শরীরের রক্ত চনমন করে ওঠে; চোখ তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, আবার নিজের অজান্তেই তার দিকে ফিরে যায়। কিন্তু সবই চুপি-চুপি, মনে মনে। দরকারের কথা ছাড়া ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার হুকুম নেই; এমনকী তাদের পানে চেয়ে হাসলেও সেটা অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। একবার আমাদের দলের একটি মেয়ে একজন ছাত্রের সঙ্গে হেসে কথা বলেছিল, সিস্টার নীলিমাদিদি দেখতে পেয়েছিলেন। নীলিমাদিদি ভীষণ কড়াপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। তখন মেয়েটিকে কিছু বললেন না, কিন্তু কাজ সারা হবার পর তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে যা বলেছিলেন তা আমরা পরে শুনেছিলুম। বলেছিলেন, ছাত্রদের মন ভোলাবার জন্যে তোমরা এখানে আসনি। ওসব বেহায়াপনা চলবে না। মনে রেখো একথা যেন দ্বিতীয়বার বলতে না হয়।

আমরা সবাই নীলিমাদিদিকে যমের মত ভয় করতুম। তাঁর কাছে বকুনি খায়নি এমন মেয়ে ছিল না। একদিন আমিও বকুনি খেলুম।

হাসি মস্করা বেহায়াপনার জন্যে নয়, কাজে ভুল করেছিলুম। দোষ আমারই। কিন্তু নীলিমাদিদি

এমন বিধিয়ে বিয়ে কথা বলেন যে, মনে হয় তার চেয়ে দু ঘা মারাও ভাল।

বকুনি খাবার পর হাসপাতালের পিছন দিকে নিরিবিলি একটা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। চোখ ফেটে জল আসছিল। মন্মথ করের সামনে না বলে কি চলত না? এমন সময় পিছনে শব্দ শুনে ফিরে দেখি—মন্মথ কর। আমার কাছে এসে দাঁড়াল, চট করে একবার চারদিকে চেয়ে নিয়ে খাটো গলায় বলল, সিস্টার নীলিমাকে ধরে মার দিতে হয়।

আমিও ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালুম। কেউ যদি দেখে ফেলে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছি, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না; নীলিমাদিদি জানতে পারবেন, আবার আমার মুণ্ডুপাত হবে।

সে তেমনি খাটো গলায় বলল, আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। কত নার্স তো রয়েছে, আপনি তাদের মত নয়। এই কথা বলতে বলতে তার উজ্জ্বল চোখ দুটি হেসে উঠল।

আমার মনের মধ্যে ভীষণ টানাটানি চলছে। একদিকে ইচ্ছে হচ্ছে পালিয়ে যাই, অন্যদিকে ইচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনি।

আপনার নাম কী নার্স?

প্রিয়ংবদা—এইটুকু বলে আমি ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলুম।

কিন্তু মনটা সারাদিন নেশায় টলমল করতে রইল। তখন জানতুম না সেটা কিসের নেশা। শরীর যখন যৌবনের ডাকে আস্তে আস্তে জেগে উঠতে থাকে তখন তার একটা নেশা থাকে, ঘুম ভাঙার নেশা। এসব তখন কিছুই জানতুম না। কীই বা জানতুম তখন! সে আজ আট-নয় বছর আগেকার কথা। কী ন্যাকা যে ছিলুম ভাবলে হাসি পায়।

তারপর থেকে যখনই ওর সঙ্গে দেখা হয়, ও মুখ টিপে হাসে, মনে হয় সে হাসিটা আরও ঘনিষ্ঠ, যেন ওর আর আমার মধ্যে একটা গোপন সম্বন্ধ হয়েছে। আড়ালে-আবডালে দেখা হয়ে গেলে চট করে দুটো কথা কয়ে নেয়—কেমন আছেন?...দুদিন দেখা পাইনি—এই ধরনের কথা।

এইভাবে দু-তিন মাস চলল। একদিন একটু বেশীক্ষণ কথা বলবার সুযোগ ঘটে গেল। দুপুরবেলা আমি দোতলার একটা ওয়ার্ডে কাজ সেরে বেরুচ্ছি, দেখি ও সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে

আছে। আমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলুম।

কাল তোত আপনার বিকেলবেলা ছুটি?

আমার গলা দিয়ে ধরা-ধরা আওয়াজ বেরুল, হ্যাঁ।

চলুন না, আমার সঙ্গে চা খাবেন।

অ্যাঁ-কোথায়?

কোন একটা সাহেবী হোটলে। আমি চারটের সময় এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

কিন্তু—ছুটির দিনে আমি বাবাকে দেখতে যাই।

ও! আপনার বাবা বুঝি কলকাতাতেই থাকেন? তা বেশ তো। আমার সঙ্গে চা খেয়ে আপনি বাবার কাছে চলে যাবেন। ঘণ্টাখানেক দেরি যদি হয়ই তাতে ক্ষতি কী?

আমি কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না। এতক্ষণে আমরা সিঁড়ির নীচে পোঁছেছি। ও বলল, তাহলে ঠিক রইল। কাল চারটের সময় আমি আপনার হস্টেলের বাইরে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকব। কেমন? মুখ টিপে হেসে সে চলে গেল।

সারাদিন ওই কথাই মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। আগে কখনও একজন পুরুষের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে চা খাইনি। এই চা-খাওয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে কত অজানা অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে। ভয়-ভয় করছে, আবার সেই নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে।

রাত্তিরে আলো নিভে যাবার পর শুক্লা এল আমার ঘরে। শুক্লার কাছে আমি কোনও কথাই লুকোই না, কিন্তু কেন জানি না, এ-কথাটা তাকে বলতে পারলুম না, সঙ্কোচ হল, লজ্জা হল; এ যেন আমার একান্ত গোপনীয় কথা, কাউকে বলবার অধিকার নেই। চায়ের নেমন্তন্নের কথা মনে মনেই রাখলুম।

পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আজেবাজে গল্প হতে লাগল। নীলিমাদিদির মেজাজ আজকাল এমন হয়েছে যে কাছে যেতে ভয় করে।...হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর লালমোহন সরকার কয়েক দিন হাসপাতালে আসেননি, তাঁর নিজেরই হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।...তুই মেটার্নিটি শিখবি?...না ভাই, তার চেয়ে চাইল্ড নার্সিং...আজ মেটার্নিটি ওয়ার্ডে কী মজা হয়েছিল জানিস?–

হঠাৎ শুক্লা বলল, হ্যাঁরে মন্মথ কর তোর দিকে চেয়ে মুচকে হাসে কেন বল্ দেখি?

কিছুক্ষণের জন্যে কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেলুম। শেষে বললুম, তুই দেখেছিস?

শুক্লা বলল, দেখিনি আবার! আরও অনেকে হয়তো দেখেছে। কী ব্যাপার বল্।

তখন আর উপায় রইল না, শুক্লাকে বললুম। চায়ের নেমন্তন্নর কথাও শোনালুম। শুনে শুক্লা বিছানায় উঠে বসল, চাপা গলায় তর্জন করে বলল, খবরদার প্রিয়া, ওর ফাঁদে পা দিসনি। সাংঘাতিক ছোঁড়া ওটা, যাকে বলে উল—তাই।

আমি বললুম, উল! সে কাকে বলে? উল মানে তো নেকড়ে বাঘ!

শুক্লা বলল, মানুষের মধ্যেও নেকড়ে বাঘ আছে। তারা কাঁচা বয়সের মেয়েদের ধরে ধরে যায়। মন্মথ কর হচ্ছে সেই নেকড়ে।

বললুম, যাঃ! তুই ঠাট্টা করছিস। কী করে জানলি তুই?

শুক্লা বলল, আমাকেও ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। লেখাপড়ায় যেমন ভাল ছেলে, বজাতিবুদ্ধিতেও তেমনি পাকা। আমাকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসত, তারপর একদিন আড়ালে পেয়ে বলল, তোমাকে বড় ভাল লাগে। নার্স তো অনেক আছে, কিন্তু তুমি তাদের মত নও।

কছুদিন পরেই চায়ের নেমন্তন্ন।

সবই মিলে যাচ্ছে। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল; তবু বললুম, ওর মতলব খারাপ তা ঝলি কী করে?

নমিতা বলেছিল। নমিতাকে তুই দেখিসনি, তুই আসবার আগেই সে নার্স হয়ে বেরিয়ে গেছে। দেখতে ভাল ছিল, মনে ছিল প্রেমের খিদে। মন্মথ-নেকড়ে প্রায় তাকে মুখে পুরেছিল, নেহাৎ কপাল জোর তাই বেঁচে গেল।

চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলুম, তারপর আবার শুয়ে পড়লুম। মনটা যেন আঁতকে উঠে অসাড় হয়ে গেছে। এত বড় ধাক্কা জীবনে খাইনি। মনে হল যেন ফুল বাগানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা লতা-পাতায় মুখ ঢাকা কুয়োয় পড়ে যাচ্ছিলুম।

শুক্লাও আমার পাশে শুলো : কি ভাবছিস?

বললুম, কিছু না। আচ্ছা শুক্লা, তোর কখনও কারুর সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে?

এবার শুক্লা একটু চুপ করে রইল, শেষে বলল, কী জানি! ভালবাসা কাকে বলে?

ভালবাসা কাকে বলে! কথাটা কখনও ভেবে দেখিনি। গল্পে উপন্যাসে পড়েছি, দুটি মানুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হল, দুজনের দুজনকে ভাল লাগল, এই কি ভালবাসা? না, আর কিছু আছে?

বললুম, তুই বল না ভালবাসা কাকে বলে।

সে আস্তে আস্তে বলল, জানিনে ভাই। ভালবাসার কতখানি চোখের নেশা কতখানি মনের মিল, কতটা স্বার্থপরতা কতটা আত্মদান, বুঝতে পারি না। যাঁরা বড় বড় প্রেমের গল্প লেখেন, কবিতা লেখেন, তাঁরাও জানেন কিনা সন্দেহ। হয়তো আগাগোড়াই জৈব বৃত্তি।

শুক্লা বিছানা থেকে নামবার উপক্রম করল : যাই ভাই, অনেক রাত হয়ে গেছে। ঘুম পাচ্ছে।

আমি তার আঁচল টেনে বললুম, কাউকে ভালবাসিস কি না বললি না তো।

সে বলল, ভালবাসা কী তাই জানি না। কি করে বলব?

বললুম, তাহলে আছে কেউ একজন! কে রে শুক্লা?

সে একটু থেমে বলল, আজ নয়, আর-একদিন বলব। তুই নেকড়ে বাঘের সঙ্গে খেতে যাবি না তো?

না, যাব না। কিন্তু গেলেই বা কী ক্ষতি হত? আমার মন যদি শক্ত থাকে, ও কী করতে পারে?

তুই বুঝিস না। চড়ুই পাখি ভাবে, আমি উড়তে পারি, অজগর উড়তে পারে না, ও আমার কী করতে পারে? তারপর যখন অজগরের সম্মোহন দৃষ্টির সামনে পড়ে যায় তখন আর নড়তে পারে না।–আচ্ছা এবার ঘুমো, নইলে সকালে উঠতে পারবি না।

শুক্লা নিঃশব্দে চলে গেল। আমি একা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম—নেকড়ে বাঘ...অজগর সাপ...সংসারে কত ভয়ঙ্কর জন্তুই না আছে! ভাবলে ভয় করে।

পরদিন থেকে মন্মথ করের সঙ্গে আর চোখাচোখি হয়নি। সে আসছে দেখলেই মনে হত—নেকড়ে বাঘ! অজগর সাপ। শুক্লা এমন ভয় আমার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সে-ভয় আজ পর্যন্ত যায়নি। কোনও পুরুষ হেসে কথা কইলেই মনে প্রশ্ন জাগে—অজগর, না নেকড়ে বাঘ?

শুক্লা কিন্তু একজনকে ভালবেসেছিল। অনেকদিন আমাকে তার নাম বলেনি। যেদিন বলল,শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

দুটো বছর কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল। প্রতি হপ্তায় বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি; কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার মনের যে পরিবর্তন হচ্ছে তা বুঝতে পারিনি। প্রথম প্রথম মন পড়ে থাকত বাড়ির দিকে; এক হপ্তা পরে বাবাকে দেখব এই আশায় মন উৎসুক হয়ে থাকত। কিন্তু ক্রমে বাড়ির দিকে টান কমে যেতে লাগল, হস্টেল এবং হাসপাতালের পরিবেশ আমার মনকে টেনে নিল। তখন হপ্তায় হপ্তায় বাড়ি যাওয়া একটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল! বাবার শরীর যে ক্রমে আরও খারাপ হচ্ছে তা লক্ষ্য করেছিলুম কি?

করেছিলুম বই কি। কিন্তু মনে কোনও আশঙ্কা জাগেনি। বাবা কি বুঝতে পেরেছিলেন, আমার মন তাঁকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে? হয়তো বুঝেছিলেন, হয়তো মনে দুঃখ পেয়েছিলেন; কিন্তু কোনওদিন একটি কথাও বলেননি। আজ সেকথা ভেবে চোখে জল আসে; তিনি তো আমার জন্যেই বেঁচে ছিলেন, আমি কেন আমার সমস্ত মন তাঁকে দিতে পারলুম না? কেন আমার মন অবশেে তাঁর কাছ থেকে সরে গেল? আমার মন তখন বড় হাল্কা ছিল, শ্যাওলার মত জলের ওপর ভেসে বেড়াত। হয়তো সব ছেলে-মেয়েরই ওবয়সে অমন হয়, জীবনে নিত্য-নতুনের আবিভাব পুরনোকে ভুলিয়ে দেয়।

শুক্লার তিন বছরের কোর্স শেষ হল, সে পাস করে ডিপ্লোমা পেল। ইচ্ছে করলেই সে স্টাফ নার্স হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু সে থাকল না। স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করবে। আমার তখনও এক বছর বাকী। শুক্লা চলে গেলে আমার এই এক বছর কী করে কাটবে?

যেদিন শুক্লা হস্টেল ছেড়ে চলে গেল তার আগের রাত্রে আমি তার ঘরে গেলুম। তার গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম। সেও একটু কাঁদল, তারপর চোখ মুছে বলল, ভাবিসনি। এক বছর কাটুক না, তোকেও টেনে নিয়ে যাব। তোকে ছেড়ে আমি একলা থাকব ভেবেছিস!

সে রাত্রে কথায় কথায় শুক্লা তার মনের অন্তরতম কথাটি বলল, ডক্টর নিরঞ্জন দাসের কথা। তম্ভিত হয়ে গেলুম। আমি ভেবেছিলুম ছাত্রদের কারুর সঙ্গে শুক্লার ভালবাসা হয়েছে; ডক্টর দারে কথা একবারও মনে আসেনি।

ডক্টর নিরঞ্জন দাস ছিলেন আমাদের গাইনকোলজির প্রফেসর। হপ্তায় একদিন আমাদের পড়াতেন, তাছাড়া নিয়মিত হাসপাতালে আসতেন। নামজাদা ডাক্তার, বিপুল প্র্যাকটিস। বয়স বোধ হয় চল্লিশের আশেপাশে কিন্তু দেখলে মনে হত ত্রিশের বেশী নয়। চেহারাতে যেমন ছেলেমানুষি ছিল, স্বভাবেও তেমনই; সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-তামাশা করতেন। তবু মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি তাঁর চোখের মধ্যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি লুকিয়ে আছে! তখন তাঁকে বড় ক্লান্ত নিষ্প্রাণ দেখাত।

আমরা সবাই নির্বিচারে তাঁকে ভালবাসতুম। সবাই ভালবাসতুম বলেই বোধ হয় শুক্লার ভালবাসা চোখে পড়ত না। যাকে সবাই ভালবাসে তাকে যে একজন বিশেষভাবে ভালবাসতে পারে একথা কারুর মনে আসে না।

ডক্টর দাস বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী জীবিতা। এইটেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

তাঁর কথা বলতে বলতে শুক্লার গলা ভারী হয়ে বুজে এল, সে ঘন ঘন আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

পঁচিশ বছর বয়সে ডক্টর দাস বিয়ে করেছিলেন। সুন্দরী বউ, বড় ঘরের মেয়ে। কিছুদিন ঘর করার পর বউয়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। অত্যন্ত মুখরা সে, কথায় কথায় অন্যের ছলছুতো ধরা তার অভ্যেস, ঝগড়ার একটা সুযোগ পেলে আর রক্ষে নেই, চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করবে। সবচেয়ে মারাত্মক তার হিংসে। স্বামীর প্রতি কিছুমাত্র

স্নেহ নেই, কিন্তু নিজের অধিকার-বোধ আছে ষোল আনা। স্বামী যদি অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে হেসে কথা বলেন অমনি তেলে-বেগুনে জ্বলে যায়, দশজনের সামনে কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাধিয়ে বসে। স্বামী গাইনকোলজিস্ট, স্ত্রী-রোগের চিকিৎসা করেন, এটা তাঁর চরিত্রহীনতার লক্ষণ, এই নিয়ে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি চেঁচামেচি।

ডক্টর দাসের সংসারে ছিলেন তাঁর বিধবা মা; আর এক পুরনো ঝি, যে তাঁকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। বউয়ের রকমসকম দেখে ঝি প্রথমে গেল, তারপর মা কাশীবাস করতে গেলেন। সংসারে রইলেন ডক্টর দাস আর তাঁর খাণ্ডার বউ।

ডক্টর দাসের অসীম ধৈর্য। তিনি যদি কড়াপ্রকৃতির মানুষ হতেন তাহলে বোধ হয় তাঁর এত দুর্দশা হত না। কিন্তু তিনি শান্তশিষ্ট মানুষ। ক্রমে ক্রমে স্ত্রীর অত্যাচার যত বাড়তে লাগল ডক্টর দাসের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ততই কমে আসতে লাগল। সারাদিন নিজের ডিস্পেন্সারিতে থাকতেন, কাজকর্ম করতেন, কেবলমাত্র রাত্রে বাড়িতে শুতে যেতেন। তাও বাড়ির আবহাওয়া যখন বেশী গরম থাকত তখন ডিস্পেন্সারিতেই রাত কাটাতেন, বাড়ি যেতেন না। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে। তিনি বাড়ি

গেলে স্ত্রী ডিস্পেন্সারিতে এসে হাঙ্গাম বাধাতেন; কম্পাউণ্ডারদের নানারকম বিশ্রী প্রশ্ন করতেন; কেলেঙ্কারির একশেষ হত। ডক্টর দাসের সহকর্মীদের মধ্যে এই নিয়ে হাসাহাসি চলত। তবে একটা উপকার হয়েছিল। সারাক্ষণ ডিস্পেন্সারিতে থাকার জন্য ডক্টর দাসের প্র্যাকটিস খুব শিগগির জমে উঠেছিল। স্ত্রীরোগের চিকিৎসক বলে তাঁর নামডাক শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল।

ডক্টর নিরঞ্জন দাসের বিবাহিত জীবনের প্রথম বারো-তেরো বছর এইভাবে কেটেছিল। রোগী। হাসপাতাল লেকচার রুম ডিস্পেন্সারি; ঘর-সংসার কেবল নামে। তপস্বীর জীবন।

শুক্লা যখন প্রোবেশনার হয়ে এসেছিল তখন সেও অন্য সকলের মত ডক্টর দাসের মধুর স্বভাবের কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু শুক্লার মনটা বড় মরমী, দু-চার দিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে, বাইরে ডক্টর দাস যতই হাসি-তামাশা নিয়ে থাকুন, অন্তরে তিনি বড় দুঃখী। শুক্লার সমস্ত মন তাঁর দিকে ঢলে পড়ল।

কিন্তু শুক্লার সবই মনে মনে। বাইরে কেউ কিছু বুঝতে পারল না, এমনকী ডক্টর দাসও না।

কিছুদিন পরে একটি ব্যাপার ঘটল।

পুরুষমানুষ মনের মত কাজ পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। ডক্টর দাসকে সামলাবার কেউ নেই। দিনরাত খেটে খেটে আর নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম করে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল; একদিন লেকচার দিতে দিতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অন্য ডাক্তারেরা তাঁকে পরীক্ষা করে। বললেন, রোগ কিছু নেই, কিন্তু ক্লান্তি আর অবসাদে জীবনীশক্তি কমে গিয়েছে। কিছুদিন হাসপাতালের কড়া নিয়মে থাকা দরকার। হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে একটি কেবিনে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। একজন ডাক্তার বন্ধু বললেন, তোমার বাড়িতে খবর পাঠাব? তিনি ম্লান হেসে বললেন, পাঠাও।

ডক্টর দাসের সেবা করবার জন্যে নার্সদের মধ্যে কাড়াকাড়ি। যারা তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছে। তারা তো আছেই, যারা হয়নি তারাও ছুটি পেলে তাঁকে এসে দেখে যায়। ডাক্তারেরা তাঁর ঘরে উঁকি না-মেরে চলে যান না।

ডক্টর দাসের পরিচর্যার জন্যে যারা নিযুক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে শুক্লা একজন। দুপুরবেলা তার পালা। তাকে ঠিক সময়ে খাওয়ানো, টনিক দেওয়া, খবরের কাগজ পড়ে শোনানো, গল্প করা, এই সব তার কাজ। দুপুরবেলা হাসপাতাল কিছুক্ষণের জন্যে ঝিমিয়ে পড়ে; তখন ডক্টর দাস বিছানায় বসেন, শুক্লাকে নানান প্রশ্ন করেন; তোমার বাড়িতে কে কে আছে?...কেউ নেই, মা বাবা মারা গেছেন।...কেউ নেই? তোমার খরচ জোগায় কে?...বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাছাড়া যা হাতখরচ পাই তাতেই চলে যায়। তোবেশনার নার্সের আর খরচ কী? এবার শুয়ে থাকুন, খাবার পর একটু বিশ্রাম করতে হয়। আপনারাই বলেন।

তিন-চার দিন যেতে না-যেতেই দুজনের মনে এক নতুন উপলব্ধি জেগে উঠল। এতদিন ডক্টর দাসের কাছে শুক্লা ছিল একশো মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে; এখন সে বিশিষ্ট একটি মেয়ে; এখন সে শুক্লা। মরমী শুক্লা, দরদী শুক্লা, শুধু নার্স নয়। শুক্লার মন আগে থেকেই উন্মুখ হয়েছিল, এখন ডক্টর দাসের মন তার কাছে এসে দাঁড়াল। যেন মনের সঙ্গে মনের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল। বন্ধনহীন গ্রন্থি।

ডক্টর দাসের শরীর বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগল। কিন্তু শরীর সারবার সঙ্গে সঙ্গে মনও বিষণ্ণ হতে লাগল। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়েছেন, কিন্তু একবারও দেখতে আসেননি। দিন ছয়-সাত কেটে যাবার পর একদিন দুপুরবেলা ডক্টর দাস শুক্লার হাত ধরে করুণ হেসে বললেন, শুক্লা, তুমি জান না, আমার জীবন একটা মস্ত ট্র্যাজেডি।

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শুক্লার বুক কান্নায় ভরে উঠল, সে বলল, জানি। কিন্তু কী নিয়ে ট্র্যাজেডি তা জানি না।

ডক্টর দাস শুক্লার হাত ধরে খাটের পাশে বসালেন। নিজে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আস্তে আস্তে নিজের দাম্পত্য জীবনের কাহিনী বললেন।

তারপরই বিচ্ছিরি কাণ্ড।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, হঠাৎ যেন ঝড়ের ধাক্কায় খুলে গেল। দুদ্দাড় শব্দে ঘরে এসে ঢুকলেন ডক্টর দাসের স্ত্রী। রণচণ্ডী মূর্তি। মুখ দিয়ে যে-সব কথা বেরুচ্ছে তা ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে বেরোয় না, অন্তত বেরুনো উচিত নয়। মুহূর্ত মধ্যে দোরের কাছে লোক জমে গেল; ডোম মেথর ঝাড়ূদারনী, সবাই ছুটে এসে দোরের কাছে ভিড় করে দাঁড়াল।

শুক্লা থ হয়ে গিয়েছিল; তারপর রাগে তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। সে উঠে গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়াল, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, বেরিয়ে যান এখান থেকে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান। এটা রোগীর ঘর, মেছোহাটা নয়।

মিসেস দাস চোখ রাঙিয়ে অসভ্য অশ্লীল কথা বলতে আরম্ভ করলেন। শুক্লা তখন একজন মেথরকে ডেকে বলল, রামদীন, এঁকে বাইরে নিয়ে যাও।

রামদীন ঝাড় হাতে এগিয়ে এল। মিসেস দাস তখন বেগতিক দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডক্টর দাস এতক্ষণ চোখ বুজে বিছানায় বসে ছিলেন, এবার চোখ খুলে শুক্লার দিকে তাকালেন। তাঁর চাউনির মানে—দেখলে তো আমার স্ত্রীকে!

কয়েকদিন পরে ডক্টর দাস সেরে উঠে আবার কাজকর্ম আরম্ভ করলেন। শুক্লার সঙ্গে তাঁর একটি নিভৃত সম্পর্কের সূত্রপাত হল। কিন্তু তাদের চোখে চোখে কখন কী কথা হত, কখন নির্জনে দেখা হত, কেউ জানতে পারল না।

আজ হস্টেলে শুক্লার শেষ রাত্রি। কাল সে চলে যাবে। ডক্টর দাস তার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা। করে রেখেছেন। ভাল পাড়ায় একটি ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে। শুক্লা সেইখানে থাকবে, আর স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করবে। ডক্টর দাসের অগাধ পসার, অগাধ প্রভাব, শুক্লাকে একদিনও বসে থাকতে হবে না।

রাত্রি বারোটা বোধ হয় বেজে গেছে। পাশাপাশি শুয়ে ভাবছি, ভালবাসার স্বরূপ কী রকম? যে ভালবেসেছে সে মনে মনে কী ভাবে? ডক্টর দাস শুক্লার চেয়ে বয়সে অনেক বড়; ভালবাসা কি বয়সের বিচার করে না? তবে কিসের বিচার করে? কী চায়? কী পায়?

একটা কথা মনে এল। শুক্লাকে জিগ্যেস করলুম, ডক্টর দাস তোকে বিয়ে করবেন তো? শুক্লা একটু চুপ করে থেকে বলল, উনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, আমি রাজী হইনি। তুই রাজী হোসনি!

না। এক বউ থাকতে আবার বিয়ে করলে ওঁর বদনাম হত, প্র্যাকটিসের ক্ষতি হত। বিয়ের দরকার কী ভাই। ভালবাসাই তো বিয়ে।

কিন্তু—

কিন্তু নেই প্রিয়া। যদি কোনও দিন সত্যিসত্যি ভালবাসিস, বুঝবি ওতে কিন্তু নেই।

নিজের কথা ভাবলি না?

ভেবেছি। এই তো আমার গর্ব। আমি যা পেয়েছি তা কটা মেয়ে পায়?

কী পেয়েছিস? ভালবাসা। একটি মানুষের মন।

পরদিন শুক্লা চলে গেল। কয়েকদিন পরে আমি চুপিচুপি তার বাসা দেখতে গেলুম। কী সুন্দর বাসাটি! দোতলায় বড় বড় তিনটি ঘর, সামনে বারান্দা। একটি ঘর অফিসের মত সাজানো, টেলিফোন আছে, দ্বিতীয় ঘরটি শুক্লার শোবার ঘর; তৃতীয় ঘরটি একরকম খালিই পড়ে আছে, আমি এসে থাকব। শুক্লা জিগ্যেস করল, কেমন?

আমি তার গলা জড়িয়ে বললুম, আমার আর তর সইছে না, ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি চলে আসি।

শুক্লা বলল, আমিও পথ চেয়ে আছি। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

দুজনে বিছানার পাশে বসলুম, প্রশ্ন করলুম, ডক্টর দাস আসেন?

শুক্লার মুখখানি নববধুর মত টুকটুকে হয়ে উঠল; সে ঘাড় নেড়ে একটু হাসল।

বললুম, কেমন লাগছে?

তার চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল; আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, সখি কি পুছসি অনুভব মোয়!

শুক্লা গান গাইতে পারে। তখন পর্যন্ত জানতুম না, তারপর অনেকবার শুনেছি। ভারি মিষ্টি গলা।

সেদিন চলে এলুম। তারপর সুবিধে পেলেই গিয়েছি। শুক্লা বলেছিল একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তা গেল বটে, কিন্তু আমার অতীতকে একেবারে নির্মূল করে দিয়ে গেল। বছর শেষ না-হতেই বাবা মারা গেলেন।

বাবার মৃত্যু বড় আশ্চর্য। যেন আমার ডিপ্লোমা পাবার অপেক্ষায় তিনি বেঁচে ছিলেন। যেদিন ডিপ্লোমা পেলুম তার দুদিন পরে তিনি হার্ট ফেল করে মারা গেলেন। শরীর ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, কেবল মনের জোরে বেঁচে ছিলেন।

বাবার কথা ভাবি। বাপ নিজের ছেলে মেয়েকে যত ভালবাসে, ছেলেমেয়েরা বাপকে তত ভালবাসতে পারে না কেন? প্রকৃতির নিয়ম! এ রকম নিয়মের মানে কী? স্নেহ শুধু নিম্নগামী না হয়ে ঊর্ধ্বগামী হলে কী দোষ হত? বুঝতে পারি না।...আমি যদি শৈশবে পিতৃহীন হতুম তাহলে কি ভাল হত? কিংবা বাবা যদি আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে ভাল হত? বুঝতে পারি না। মৃত্যুকালে তাঁর হাতে মাত্র সাতশো টাকা ছিল; বেশীদিন বেঁচে থাকলে হয়তো অর্থকষ্টে পড়তেন। আমি রোজগার করে তাঁকে খাওয়াব সে-ভাগ্য কি করেছি? মেয়ে খালি নিতেই পারে, দিতে পারে না।

শুক্লার বাসায় এসে উঠলুম। এই বাসা। এখানে পাঁচ বছর কেটেছে। একটা ঘরে শুক্লা থাকে, একটা ঘরে আমি; অফিস-ঘরটা ভাগের। একটি ছোট্ট রান্নাঘর আছে, তাতে যার

যেদিন ছুটি সে রান্না করে, দুজনে মিলে খাই। যেদিন দুজনেরই কাজ থাকে সেদিন সামনের হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খাই। একটা শুকো ঝি দিনের বেলা কাজ করে দিয়ে যায়। কী সুখে আছি আমরা তা বলতে পারি না। এই ছোট্ট বাসাটি আমাদের স্বর্গ।

কাজের দিক দিয়েও সুবিধে হল। আগে শুক্লা একলা সব কাজ সামলাতে পারত না, এখন দুজনে মিলে সামলে নিই।

ডক্টর দাস মাঝে মাঝে আসেন। রোজ আসেন না, হপ্তায় একদিন কি দুদিন। একটু রাত করে আসেন। আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন; রাত শেষ হবার আগেই চলে যান। নিজের জন্যে তাঁর ভাবনা নেই, কিন্তু পাছে শুক্লার বদনাম হয় তাই সতর্কভাবে যাওয়া-আসা করেন। তাঁর স্ত্রী জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

আমার সঙ্গে এ বাসায় যেদিন তাঁর প্রথম দেখা হল তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। বললেন, প্রিয়ংবদা, তুমি এসেছ খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু দেখো, শুক্লার মত কেলেঙ্কারি করো না, যাকে ভালবাসবে তাকে বিয়ে করো।

আমি ওকথার উত্তর না দিয়ে বললুম, আমি কিন্তু আপনাকে জামাইবাবু বলে ডাকব।

তিনি আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন, আর আমি তোমাকে কী বলে ডাকব?—প্রিয়া?

আপনার প্রিয়া তো ওই—এই বলে আমি শুক্লাকে দেখালুম। শুক্লা পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হসছিল।

তিনি বললেন, তাহলে তোমাকে সখী বলব। তুমি যেমন শুক্লার সখী তেমনি আমারও সখী।

সেই থেকে তিনি আমাকে সখী বলে ডাকেন।

পুরনো কথা, লিখতে লিখতে অনেক পথে-বিপথে ঘুরে বেড়ালুম, এবার ফিরে আসি। আজ আমার জন্মদিন। বাইরে অবিশ্রাম ধারাবর্ষণ চলেছে। লিখতে লিখতে মন বসে গিয়েছিল, এদিকে রাত্রি এগারোটা। শুক্লা আটটা বাজতে-নাবাজতেই বেরিয়েছে, তার আজ সমস্ত রাত কাজ; সেই ভোরবেলা ফিরবে। বাসায় আমি একা।

শুক্লা আজ আমার জন্মদিনে একটি চমৎকার জিনিস উপহার দিয়েছে। একটি আয়না, চার ফুট লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া। দুজনে মিলে আমার শোবার ঘরে টাঙিয়েছি, তার মাথায় ইলেকট্রিক বালব, নীচে আমার কাপড়চোপড় রাখার ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের মাথায় প্রসাধনের তেল ক্রীম স্নোর শিশি সাজিয়েছি। কী সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘরের শ্রী ফিরে গেছে।

ডক্টর দাস পাঠিয়েছেন প্রকাণ্ড একটি কেক। আমরা আজ এ-বেলা রান্না করিনি, কেক খেয়েই পেট ভরিয়েছি। আজ ডক্টর দাস আসবেন না, তিনি জানেন শুক্লা কাজে বেরিয়েছে। কাল বোধ হয় আসবেন। তখন তাঁকে আমার জন্মদিনের কেক খাওয়াব।

শুক্লা বেরিয়ে যাবার পর আমি ডায়েরি লিখতে বসেছি। এখন এগারোটা বেজে গেছে। অনেক রাত হল—

কিড়িং কিড়িং–। পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। এত রাত্রে কার দরকার হল!

# ১৮ই শ্রাবণ।

কাল রাত্তিরে সে কী কাণ্ড!

অফিস-ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলুম, নিজের টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললুম, কাকে চাই?

হেঁড়ে গলায় উত্তর এল, প্রিয়দম্বা ভৌমিককে চাই।

রাগে গা জ্বলে গেল। কি রকম অসভ্য। আমার নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে জানে না। বললুম, প্রিয়দম্বা নয়, প্রিয়ংবদা। আমিই মিস্ ভৌমিক। কী চাই বলুন?

হেঁড়ে গলা বলল, আমার বাচ্চা মেয়ের ভয়ানক অসুখ, তাকে রাত জেগে দেখাশোনা করবার কেউ নেই। আপনাকে আসতে হবে।

রাত দুপুরে ডাক আসা আমাদের পক্ষে কিছু নতুন নয়। কিন্তু আজ মনটা কেমন বেঁকে বসল। তবু এক কথায় যাব না বলা চলে না। বললুম, আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন?

আমি শঙ্খনাথ ঘোষ। ১১৭ বেলেঘাটা নিউ অ্যাভিনিউ থেকে বলছি।

রাত্তিরে কাজ করলে আমার ফী পঞ্চাশ টাকা।

দেব পঞ্চাশ টাকা।

কিন্তু এই বৃষ্টিতে যাব কী করে? এত রাত্রে ট্যাক্সিও পাওয়া যাবে না।

আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসুন।

গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য লোক। আমি যেতে পারব কি না, বাড়িতে আছি কি না,– জেনেই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন আর এড়াবার উপায় নেই। টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে গেলাম।

শোবার ঘরে নার্সের ইউনিফর্ম পরতে পরতে ভীষণ রাগ হতে লাগল। বড়মানুষ নিয়েই আমাদের কাজ; যারা গরিব তারা তো আর রোগীর সেবার জন্য নার্স ডাকতে পারে না, নিজেরাই যতটুকু পারে সেবা-শুশ্রুষা করে। কিন্তু এই বড়মানুষগুলো যেন কী রকম, ওদের চালচলন ভাবভঙ্গি সব আলদা; দুচক্ষে দেখতে পারি না। যাঁরা বনেদী বড়মানুষ তাঁরা ভদ্র ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু মুরুব্বীয়ানায় অনুগ্রহের ভাব; টাকাকড়ি সম্বন্ধে ভারি চালাক, এঁদের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় করা কঠিন কাজ। আর যাঁরা ভুঁইফোঁড় বড়মানুষ তাঁরা দুহাতে টাকা ছড়াতে ভালবাসেন, কিন্তু ব্যবহার একেবারে চাষার মত। মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানেন না; ভাবেন টাকা দিলেই

যথেষ্ট, ভদ্রতার দরকার নেই। এই শঙ্খনাথ ঘোষটি বোধ হয় ভুঁইফোঁড় বড়মানুষ। প্রিয়দম্বা। কী কথার ছিরি! লেখাপড়া শিখেছেন বোধ হয় পাঠশালা পর্যন্ত। অথচ টাকা আছে।

ভোঁ ভোঁ। রাস্তায় দোরের সামনে মোটরহনের আওয়াজ শুনে বুঝলুম মোটর এসেছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সদর-দরজায় তালা লাগিয়ে বেরুতে হল, বাসায় কেউ থাকবে না। শুক্লার কাছে আলাদা চাবি আছে, সে যদি আমার আগে ফেরে কোনও অসুবিধে হবে না।

নীচে নেমে দেখলুম প্রকাণ্ড জাহাজের মত একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল, আমি টুক করে গাড়িতে উঠে পড়লুম; তবু মাথা মুখ বৃষ্টিতে ভিজে গেল। বাবা, কী বৃষ্টি! আমার জন্মদিন বেশ জানা দিচ্ছে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে ড্রাইভার জিগ্যেস করল, আপনি মিস্ ভৌমিক?

হ্যাঁ।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। ঝাপসা নির্জন রাস্তা দিয়ে কোথায় চলেছি বোঝা যায় না। যেন স্বপ্নের মধ্যে কোন্ এক রহস্যময় অভিযানে চলেছি, জেগে উঠে দেখব ডায়েরি লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

পাঁচ মিনিট পরে গাড়ি লোহার ফটক পার হয়ে ছাদ-ঢাকা গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল। একজন ফিটফাট উর্দিপরা চাকর বেরিয়ে এল, গাড়ির দোর খুলে বলল, আসুন মিস্।

আমি নামলুম। চাকরটা ড্রাইভারকে ফিসফিস করে কী বলল, তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বলল, আমার সঙ্গে আসুন, দোতলায় যেতে হবে। ড্রাইভার মোটর ঘুরিয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

আমি চাকরের সঙ্গে যেতে যেতে নীচের তলার কয়েকটা ঘর দেখতে পেলুম; সব ঘরেই উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। একটা ঘর ড্রয়িংরুমের মত সাজানো। কিন্তু কোথাও লোজন নেই। বাড়িটা চমৎকার, ঝকঝকে নতুন। মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভাবলুম, ভুইফোঁড় বড়মানুষই বটে; বোধ হয় যুদ্ধের বাজারে ধান-চালের ব্যবসা করে লাখপতি।

ওপরতলাটা আলোয় আলো, যেন বিয়ে বাড়ি। কিন্তু মানুষ নেই। চাকর আমাকে নিয়ে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড ঘর, নার্সারির মত সাজানো; শিশুর ছোট্ট খাট, দোলনা; নানা রকম ছোট-বড় খেলনা ঘরের চারিধারে ছড়ানো রয়েছে। দুটো বড় বা জ্বলছে। একটা ঘাগরা-পরা ঝি-জাতীয় স্ত্রীলোক দোরের পাশে উবু হয়ে বসে আছে। আর, একজন পুরুষ একটি শিশুকে বুকে নিয়ে পায়চারি করছেন।

চাকর দরজার কাছ থেকে নিচু গলায় বলল, বাবু, নার্স এসেছেন।

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। ঘন ভুরুর নীচে থেকে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল। তারপর চোখ দুটো আমার মুখ থেকে নেমে দোরের পাশে ঝিয়ের ওপর পড়ল। কলাবতী। ঝি তখনই উঠে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াল—খুকিকে শুইয়ে দাও। দেখো, ওর ঘুম না ভেঙে যায়।

ঝি অতি সন্তর্পণে শিশুকে কোলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল; শিশু একটু উসখুস করল, কিন্তু জাগল না। তখন ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। তামাটে ফরসা রঙ, দোহারা গড়ন, কিন্তু ভুড়ি নেই; মুখখানা যেন পেটাই-করা লোহা দিয়ে তৈরি। একটু রুক্ষ রুক্ষ ভাব। মেয়েকে নিশ্চয় খুব ভালবাসেন, নিজেই তাকে বুকে করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ওঁর স্ত্রী কোথায়? তবে কি বিপত্নীক?

লোকটির প্রতি মনে একটু সহানুভূতি জাগতে শুরু করেছিল, কথা শুনে সাহনুভূতি উবে গেল। যেন বেশ আশ্চর্য হয়েছেন এমনিভাবে বললেন, তুমি নার্স? প্রিয়দম্বা ভৌমিক?

আপরিচিত মহিলাকে আপনি বলতে হয় তাও তিনি জানেন না। তার ওপর প্রিয়দম্বা! দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, প্রিয়দম্বা নয়—প্রিয়ংবদা।

তিনি বললেন, ও একই কথা। তুমি নার্স। রোগীর সেবা করতে জান?

ডিপ্লোমা দেখবেন?

দরকার নেই। ডাক্তার যখন রেকমেণ্ড করেছে তখন জান নিশ্চয়। আমার ধারণা ছিল নার্সদের বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ হয়।—সে যাক, আমার মেয়ের বড় অসুখ, রাত্তিরে তার দেখাশোনা করবার লোক নেই। যতদিন দরকার তোমাকেই রাত্তিরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন করলুম, রোগটা কী?

মেনিঞ্জাইটিস্।

কোন ডাক্তার দেখছেন?

দেখেছে অনেক ডাক্তারই। চার্জে আছে আমার ফ্যামিলি ডাক্তার। সে আজ রাত্রি দশটা পর্যন্ত এখানে ছিল। এস, তাকে ফোন করতে হবে। সে তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি পাশের ঘরে গেলেন, আমি সঙ্গে গেলুম। এ ঘরে টেলিফোন আছে, তিনি টেলিফোন তুলে ডায়েল করলেন, বললেন, হ্যালো ডাক্তার, নার্স এসেছে, তাকে কী বলতে চান বলুন। এই বলে টেলিফোন আমার হাতে দিলেন।

ডাক্তারের কথা শুনলুম। রোগ এখন পড়তির দিকে; ভয়ের অবস্থা কেটে গেছে। তবে নজর রাখতে হবে। কী কী করতে হবে আমাকে জানালেন, তারপর স্নিগ্ধস্বরে বললেন, কাল সকালে দেখা হবে। গুড নাইট নার্স।

গুড নাইট ডক্টর।

ডাক্তারের নাম জানতে পারলুম না, টেলিফোনে গলা শুনেও চেনা গেল না। বোধ হয় জামাইবাবুর কোনও বন্ধু; নইলে আমাকে রেকমেণ্ড করবেন কেন!

পাশের ঘরে ফিরে গিয়ে রোগীর চার্জ নিলুম। রাত্রি তখন ঠিক বারোটা। শঙ্খনাথবাবুকে বললুম, আপনার আর এখানে থাকবার দরকার নেই। তবে বাচ্চার মা যদি মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতে চান তো দেখে যেতে পারেন। বাচ্চার মা সম্বন্ধে মনে একটু কৌতূহল হয়েছিল।

শঙ্খনাথবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল, গলার আওয়াজ কর্কশ হয়ে উঠল। তাঁর গলা স্বভাবতই মোটা, তার সঙ্গে রাগ মিশে গলার আওয়াজ বাঘের চাপা গর্জনের মত শোনাল। তিনি বললেন, ওর মা! সে তো নাচতে গিয়েছে।

আমি ভুরু তুলে চেয়ে রইলুম। তিনি বললেন, নাচ জান না? একজন পুরুষকে জাপটে ধরে ধেই-ধেই নাচ। আজ বিলিতী হোটেলে পার্টি আছে, আমার বউ না-গিয়ে থাকতে পারে? মেয়ের অসুখ, তাতে কী? নাচবার এত বড় সুযোগ কি ছাড়া যায়?

আমি লজ্জিত হয়ে পড়লুম। ঘরের কেচ্ছা যে শঙ্খনাথবাবু একজন অপরিচিতার কাছে এত সহজে প্রকাশ করবেন তা আশা করিনি। খুব রাগ হয়েছে বলেই বোধ হয় মনের কথা চেপে রাখতে পারেননি। কুণ্ঠিত হয়ে বললুম, তিনি নিশ্চয় এখনি ফিরবেন।

বলে গিয়েছিল দশটার মধ্যে ফিরবে, বারোটা বেজে গেছে। দুত্তোর! বলে তিনি একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমার মনে আবার সহানুভূতি এল। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল নেই; এ যেনডক্টর দাসের দাম্পত্য জীবনের উল্টো পিঠ। জিগ্যেস করলুম, আপনি বুঝি পার্টিতে যান না?

শঙ্খনাথবাবু চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন; আমি পার্টিতে যাব! কী বলছ তুমি প্রিয়দম্বা? আমি মুখখু অসভ্য, নাচতে জানি না, ব্রিজ খেলতে জানি না, ছুরিকাঁটা ধরে ডিনার খেতে জানি না—আমি পার্টিতে যাব! তোক হাসবে না। আমার স্ত্রী সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? তাছাড়া মেয়েটাকে দেখবার একটা লোক চাই তো। আজ তিন রাত্তির ঘুমুইনি। তিনি ক্লান্তভাবে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন।

কেন জানি না আমার রাগ হল। বললুম, আগে নার্সের ব্যবস্থা করেননি কেন? তাহলে তো তিন রাত্তির জেগে থাকতে হত না!

তিনি দুই হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, প্রিয়দম্বা, আমি গরিবের ছেলে, গরিবি চালে মানুষ হয়েছি। বাড়িতে কারুর অসুখ হলে মা-খুড়ি বাপ-খুড়োরাই সেবা করে। এখন আমার টাকা হয়েছে, কিন্তু নার্স রেখে তার ঘাড়ে সেবার ভার তুলে দেওয়া যায় একথা মনেই আসেনি। আজ ডাক্তার বলল তাই খেয়াল হল।

লোকটি মুখখু এবং অসভ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু স্পষ্টবক্তা। নিজের সম্বন্ধেও স্পষ্ট কথা বলতে সংকোচ নেই। আমি বললুম, আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে। কোনও চিন্তা নেই, আমি এখানে রইলুম।

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, আমি আর কোথায় যাব, এই ঘরেই শুয়ে থাকি।–কলাবতী!

পশ্চিমা ঝি-টা আবার গিয়ে দোরের কাছে বসে ছিল, উঠে এসে কাছে দাঁড়াল। থ্যাবড়া-থ্যাবড়া মুখ, নাকে নোলকের আংটি; বয়স আন্দাজ তিরিশ। শঙ্খনাথবাবু তাকে বললেন, তুমিও তিন রাত্তির জেগে আছ, যাও ঘুমোও গিয়ে। আর শিউসেবককে বলে দিও মাকিনী না ফেরা পর্যন্ত যেন জেগে থাকে।

জি–কলাবতী চলে গেল।

এই সময় বিছানায় বাচ্চা একটু উসখুস করল। আমি গিয়ে চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসলুম; তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বর আছে; কিন্তু বেশী নয়। আমি গায়ে হাত রাখতেই সে আবার শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

তার মুখের পানে চেয়ে রইলুম। বয়স বছর দেড়েকের বেশী নয়; মুখখানি যেন গোলাপফুল ফুটে আছে। এত অসুখেও চোখ ফেরানো যায় না। শঙ্খনাথবাবু আমার সঙ্গে খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি তাঁর পানে চোখ তুলে চাইতে দেখলুম তিনি সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম-ঠিক আছে।

তিনি গিয়ে দূরের একটা জানলা খুললেন, আবার তখনই বন্ধ করে দিলেন। বাইরে বৃষ্টি চলেছে, বিরাম নেই বিশ্রাম নেই।

জানলার কাছে একটা গদিমোড়া ডিভান ছিল, শঙ্খনাথবাবু তাতে বসলেন, আমাকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বললেন, পাশের ঘরে চায়ের সরঞ্জাম আছে, যদি রাত্তিরে খেতে চাও

আমি নিঃশব্দে হাত তুলে তাঁকে আশ্বাস দিলুম দরকার হলে খাব। তিনি তখন ডিভানের উপর লম্বা হয়ে শুলেন।

আধ ঘণ্টা শিশুর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি...মেনিঞ্জাইটিস। কঠিন রোগ, কিন্তু এখন রোগ বশে এসেছে; শিশু সেরে উঠবে। শুধু নজর রাখা দরকার, এতটুকু ত্রুটি না হয়। ...এই শিশুর মা কী রকম মা? আধুনিকা অনেক দেখেছি, আমিও তো আধুনিকা। কিন্তু

নিজের রুগ্ন সন্তানকে বাড়িতে ফেলে নেচে বেড়াতে কাউকে দেখিনি। হয়তো এটা আধুনিকতার দোষ নয়, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষ। কিন্তু মেয়ের মায়ের দোষ যতই থাক, নিশ্চয় অপূর্ব সুন্দরী। মেয়ে এত রূপ বাপের কাছ থেকে পায়নি। বাপের চেহারা তো গুণ্ডার মত।

ঘাড় ফিরিয়ে শঙ্খনাথবাবুর দিকে চাইলুম। তিনি কনুইয়ে ভর দিয়ে করতলে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছেন, দৃষ্টি আমার ওপর। কিন্তু দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু নেই, কেবল নির্বাক কৌতূহল। আমার মত জীব তিনি জীবনে দেখেননি, তাই নিষ্পলক চেয়ে আছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হবার পরও তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন না, একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

মুখের পানে একদৃষ্টে কেউ চেয়ে থাকলে অস্বস্তি হয় না? আমি উঠে গিয়ে ডিভানের কাছে দাঁড়ালাম; তিনি উঠে বসলেন। বললুম, আমি যখন চার্জ নিয়েছি তখন আপনার জেগে থাকার মানে হয় না। আপনি ঘুমুবার চেষ্টা করুন না।

তিনি বললেন, ঘুমুবার চেষ্টা! আমাকে চেষ্টা করতে হয় না, চোখ বুজে শুলেই ঘুমুতে পারি। আজ ইচ্ছে করে জেগে আছি। পিউ এখন কেমন আছে?

পিউ! খুকির নাম বুঝি পিউ?

হ্যাঁ। কেমন আছে?

ভালই আছে বলে আমি আবার গিয়ে বসলুম।

পিউ! পাপিয়ার ডাক। ছোট্ট একটি পাখির মিষ্টি একটু কাকলি। এই মেয়েটি পাখি নয়, পাখির কুজন। যে নাম রেখেছে তার রসবোধ আছে। শঙ্খনাথবাবু নিশ্চয়।

পিউ একটু উসখুস করল। তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলুম। সে আবার শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

একটা বেজে গেছে। বৃষ্টির ঝরঝর ঝঝম্ শব্দ যেন একটু মন্দা হয়ে আসছে। মনে হল নীচে গাড়ি বারান্দায় একটা মোটর এসে থামল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, শঙ্খনাথবাবু উঠে বসেছেন। তাঁর চোখে গনগনে আগুন, চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে ওপরের বারান্দায় মেয়েলি জুতোর খুটখুট শব্দ শুনতে পেলুম, আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার ঘাড় আপনিই সেই দিকে ঘুরে গেল, দোরের পানে চেয়ে রইলুম।

দোরের সামনে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। আরব্য উপন্যাসের হুরী-পরীদের দেখিনি, কিন্তু তারা এত সুন্দর কখনই ছিল না। মনে হল মেঘে-ঢাকা আকাশ থেকে এক ঝলক বিদ্যুৎ দরজার ফ্রেমের মাঝখানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিপছিপে লম্বা ধরনের গড়ন, দুধে-আলতা রঙ; মুখখানি কুঁদে কাটা। পরনে খুব ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি, তার

চেয়ে একটু গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ; সবার ওপরে একরাশ হীরে আর পান্নার গয়না শিশিরবিন্দুর মত ঝলমল করছে। কিন্তু ওর রূপের বর্ণনা আর লিখতে পারি না; নিজেরই হিংসে হয়।

দরজার সামনে এসে প্রথমেই তার চোখ পড়েছিল আমার ওপর। সে আমাকে একনজর ভাল করে দেখে নিল। তার নরম রাঙা ঠোঁটে একটু মিষ্টি হাসি খেলে গেল।

হাসিটি কিন্তু স্থায়ী হল না। শঙ্খনাথবাবু পাগলা হাতির মত তার সামনে ছুটে এলেন, চাপা গর্জনে বললেন, দশটা বেজেছে?

একটি আঙুল ঠোঁটের ওপর রেখে পরী বলল, চুপ। পিউ জেগে উঠবে।

শঙ্খনাথবাবু ভেংচি কাটার স্বরে বললেন, পিউ জেগে উঠবে! এতক্ষণ পিউয়ের কথা মনে ছিল না?

পরীর মুখখানি ব্যথায় ভরে উঠল, সে করুণ সুরে বলল, মনে ছিল না। সারাক্ষণ কেবল পিউয়ের কথাই ভেবেছি। কিন্তু আসব কী করে? যা বিষ্টি, সাপের মুখ ছিঁড়ে যায়।

শঙ্খনাথবাবু বললেন, যখন বেরিয়েছিলে তখন বিষ্টি কিছু কম ছিল না। বেরুলে কেন? একটা দিন না-নাচলে কি চলত না?

পরী চকিত আড়চোখে আমার পানে তাকাল। বাইরের লোকের সামনে দাম্পত্য কলহ বাঞ্ছনীয় নয়। সে স্বামীর কথার উত্তর না দিয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল। পিউয়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। মেয়ের পানে একবার তাকাল কি তাকাল না, আমার পানে চেয়ে নরম হেসে বলল, আপনি বুঝি নার্স? বাঁচলুম। পিউয়ের জন্যে আর ভাবনা নেই।

শঙ্খনাথবাবু স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি গলার মধ্যে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করলেন। বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলেন—পিউয়ের জন্যে ভেবে ভেবে তোমার তো ঘুম হচ্ছে না। কিন্তু তিনি কোনও কথা বলবার আগেই পরী আবার ঠোঁটে আঙুল রেখে তাঁকে থামিয়ে দিল। ফিসফিস করে বলল, চুপ! তোমার গলার আওয়াজে পিউ চমকে উঠবে।

আমি কব্জির ঘড়ি দেখে বললুম, আপনারা বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমাকে এবার ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

ইঞ্জেকশন! পরী ত্রস্ত হয়ে উঠল,—চল আমরা যাই। এই বলে সে আর দাঁড়াল না, দোরের দিকে পা বাড়াল।

শঙ্খনাথবাবু একটু ইতস্তত করলেন, বললেন, আমি থাকব?

না, দরকার নেই, বলে আমি ব্যাগ তুলে নিলুম। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলুম, আগে আগে পরী এবং পিছন পিছন দৈত্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইঞ্জেকশন তৈরি করতে করতে পরীর কথাই মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে লাগল। হয়তো আমুদে আহ্লাদে মেয়ে; নিজের সংসারে আমোদ-আহ্লাদের সুযোগ কম, তাই বাইরের দিকে মন পড়ে থাকে। মেয়েকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার নামে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। হয়তো শরীরের কষ্ট দেখতে পারে না। অনেক লোক আছে যারা রক্ত দেখলে ভির্মি যায়। আমি নিজেই বা কী ছিলুম? প্রথম যেদিন হাসপাতালে মড়া দেখি সেদিন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। এখন অবশ্য সবই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। পরী তো আর নার্স নয়, সে এসব দেখতে পারে না। কিন্তু কথাবাতা চালচলন খুব মিষ্টি। আর কী রূপ! শঙ্খনাথবাবুকে ভাগ্যবান বলতে হবে। এমন বউ সকলের ভাগ্যে জোটে না।

ইঞ্জেকশন দিলুম। পিউ একটু নড়েচড়ে কাঁদবার উপক্রম করল, সুন্দর মুখখানি কুঁচকে উঠল; কিন্তু সে কাঁদল না। চোখ মেলে কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, তারপর ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আজ রাত্রে আমার কোনও কাজ নেই। শুধু পিউয়ের পানে চেয়ে বসে থাকা।

বৃষ্টি বোধ হয় থেমে গেছে; বাইরে আর সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে থেকে দুটি গলার আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। একটি স্বর মোটা এবং অস্পষ্ট, অন্য স্বর মিহি এবং স্পষ্ট। বোধ হয় শোবার ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হচ্ছে—

...তুমি বুঝতে পারছ না কেন, ইচ্ছে করলেই কি পার্টি ছেড়ে চলে আসা যায়? আমি তো চলেই আসছিলুম, কিন্তু সবাই পথ আগলে দাঁড়াল, বলল, এত বিষ্টিতে যেতে দেব না। গাড়িও ছিল না তারপর কিছুক্ষণ মোটা গলার আফসানি...তারপর আবার মিহি গলা—সমাজে থাকতে গেলে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হয়...বোরকা মুড়ি দিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকার দিন কি আর আছে? লোকে হাসবে যে। তুমি মেলামেশা করতে ভালবাস না, তাই। আমাকেই করতে হয়। লৌকিকতা না রাখলে চলবে কেন?...

এইভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কথাকাটাকাটি চলল, তারপর আস্তে আস্তে সব ঝিমিয়ে পড়ল। বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, আমি বসে বসে ভাবছি...দাম্পত্য কলহ...বাবা বলতেন বারম্ভে লঘুক্রিয়া...ওরা ঝগড়াঝাঁটি করে এক বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে...ওদের মধ্যে ভাল কে? মন্দ কে? হয়তো মানুষ হিসেবে দুজনেই ভাল, কিন্তু বিপরীত ধাতের মানুষ। স্বামী উগ্র রুক্ষ অশিক্ষিত, স্ত্রী আধুনিকা প্রগতিশীলা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এরা মানুষ হয়েছে; কেউ কারুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। এমনি ভাবে ঝগড়া করে আর এক বিছানায় শুয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে...

আমি নার্স, জেগে জেগে ঘুমিয়ে নিতে পারি। রোগীর বিছানার পাশে চোখ চেয়ে বসে আছি। রোগী ঘুমুচ্ছে, আমার কোনও কাজ নেই। সোজা বসে আছি চোখ মেলে, কিন্তু মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে; জেগেও নেই, আবার ঘুমুচ্ছিও না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। যারা রাত জেগে সেবা করে তাদের মন এইভাবে বিশ্রাম করে নেয়।

খসখস শব্দে দোরের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম শঙ্খনাথবাবু দুহাতে দুপেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। ঘড়ি দেখলুম, তিনটে বেজে গেছে।

আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, এক পেয়ালা চা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

চায়ের পেয়ালা নিলুম। তিনি মেয়ের দিকে একবার চোখ বেঁকিয়ে ভ্রূ তুলে আমার পানে চাইলেন। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম—ভাল আছে।

তিনি তখন একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। আমিও উঠে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম। পেয়ালা ঠোঁটে ঠেকাতেই মনটা খুশি হয়ে উঠল। শেষ রাত্রে অপ্রত্যাশিত গরম চা বড় মিষ্টি লাগে।

নিচু গলায় বললুম, আপনি চা তৈরি করলেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। আর কে করবে? আমার গিন্নী? তিনি ঘুমুচ্ছেন, বেলা দশটার আগে বিছানা ছাড়বেন না।

গিন্নীর প্রসঙ্গ বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, তাই প্রশ্ন করলুম, আপনি ঘুমুলেন না কেন?

তাঁর মুখখানা বিরাগে ভরে উঠল,—ঘুমুতে ইচ্ছে হল না। আর কতটুকুই বা রাত্রি আছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভোর হয়ে যাবে।

চা খাওয়া শেষ হলে শঙ্খনাথবাবু পেয়ালা দুটো পাশের ঘরে রাখতে গেলেন, আমি আবার পিউয়ের বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। শঙ্খনাথবাবু ফিরে এসে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আমি বসে বসে অনুভব করলুম, তাঁর চোখ থেকে থেকে আমার দিকে ফিরছে। আমার সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময় আর কৌতূহল এখনও কাটেনি।

তারপর ক্রমে ফরসা হল, জানলার কাচের ভিতর দিয়ে দিনের আলো দেখা গেল। বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু মেঘ কাটেনি।

বাড়ি জেগে উঠল। প্রথমে ঘরে এল কলাবতী, তারপর শিউসেবক। কলাবতী পিউয়ের খাটের পাশে মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসল, তারপর পিউয়ের পানে হাত বাড়াল। আমি অবাক হয়ে বললুম, এ কী?

কলাবতী হেসে বলল, বাচ্চা দুধ খাবে।

বললুম, দুধ! কোথায় দুধ?

কলাবতী নিজের বুকের ওপর হাত রেখে বলল, এইখানে।

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম। কলাবতী আমার মুখের ভাব দেখে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল।

শঙ্খনাথবাবু কলাবতীর পিছনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কী হয়েছে?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ঝি বলছে পিউ নাকি–

উনি বললেন, কলাবতীর দুধ খায়? হ্যাঁ, জন্মে পর্যন্ত পিউ কলাবতীর দুধ খায়। ওর মা তো ওকে দুধ দেয়নি। ফিগার খারাপ হয়ে যাবে যে!

আমার মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠল, কোন্ দিকে তাকাব ভেবে পেলুম না। শেষে বললুম, ডাক্তারের আপত্তি নেই?

না। আপত্তি হবে কিসের জন্যে?

না না, তা বলছি না, কিন্তু–

ইতিমধ্যে কলাবতী পিউকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম। কী যে এদের মতিগতি কিছুই বুঝি না। এরকম ব্যাপারে আমার অভ্যাস নেই। কিন্তু ডাক্তার যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন আর বলবার কী আছে?

শিউসেবক খাটো গলায় বলল, নার্স সাহেব, পাশের ঘরে চা দেওয়া হয়েছে, আপনি মুখ ধোবেন কি?

সাদা টাইল বাঁধানো ঝকঝকে বাথরুমে গেলুম, তারপর ডাইনিং রুমে গিয়ে চা খেতে বসলুম। প্রকাণ্ড ঘর, মাঝখানে লম্বা টেবিল, তার এক পাশে খাবার দেওয়া হয়েছে। শুধু চা নয়, টোস্ট, ডিম, এক গেলাস গরম দুধ। শঙ্খনাথবাবু টেবিলের পাশে বসেছেন, তাঁর সামনে কেবল এক গেলাস দুধ।

আমি খেতে আরম্ভ করলুম, বললুম, নার্সকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ানোর কিন্তু নিয়ম নেই। শঙ্খনাথবাবু বললেন, নিয়মকানুন আমি জানি না। বলেছি তো আমি চাষা মনিষ্যি, যা মনে আসে তাই করি।

আমি খেতে লাগলুম, তিনি মাঝে মাঝে দুধের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে আমার খাওয়া দেখতে লাগলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা বলে চললেন। ছাড়া ছাড়া কথা। তা থেকে তাঁর পারিবারিক পরিস্থিতির কিছু খবর পেলুম। কলাবতী হচ্ছে শিউসেবকের বউ। ওরা চার-পাঁচ বছর ওঁর বাড়িতে চাকরি করছে। ওরা পশ্চিমা পাহাড়ী জাতের লোক, বোধ হয় গাড়োয়ালী; শঙ্খনাথবাবুর অত্যন্ত অনুগত, ওঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারে। ...শঙ্খনাথবাবুর স্ত্রীর নাম সলিলা; রিটায়ার করা সিভিলিয়ানের মেয়ে। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছে। কী দেখে সলিলা শঙ্খনাথবাবুকে বিয়ে করেছিল জানি না; বোধ হয় টাকা দেখে।...পিউ তাঁদের একমাত্র সন্তান। জন্মাবধি ঝিয়ের কোলেই মানুষ। কলাবতীরও একটি বছর দেড়েকের ছেলে আছে।

.

বেলা আটটার সময় ডাক্তার এলেন।

ডাক্তারকে দেখে চমকে উঠলুম : মন্মথ কর। তেমনই ধারালো মুখ, তেমনই ফিটফাট চেহারা। পরনে শার্ক-স্কিনের সুট। দেখে মনে হয় প্রাটিস বেশ ভালই চলছে। মুচকি হেসে বললেন, আমাকে চিনতে পেরেছেন দেখছি।

তাঁকে প্রথম দেখে চমকে উঠেছিলাম বটে, কিন্তু নেকড়ে বাঘ আর অজগর সাপের ভয় আমার কেটে গেছে। বললুম, হ্যাঁ, কাল টেলিফোনে গলা শুনে চিনতে পারিনি। আপনি ভাল আছেন?

হেসে বললেন, চলছে একরকম! আপনি তো আলাদা বাসা নিয়ে প্র্যাকটিস করছেন, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে দেখলাম। সঙ্গে আর কে থাকেন?

বললুম, শুক্লা। আমার বন্ধু শুক্লা। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি।

তিনি ভাবতে ভাবতে বললেন, শুক্লা—তিনিও কি নার্স?

হ্যাঁ। তাকে আপনার মনে নেই। দেখলে হয়তো চিনতে পারবেন। আসুন, আপনার পেশেন্টের কাছে নিয়ে যাই। পেশেন্ট ভাল আছে।

ডাক্তারকে পিউয়ের ঘরে নিয়ে গেলুম; শঙ্খনাথবাবুও সঙ্গে এলেন। কলাবতী পিউকে আবার শুইয়ে দিয়ে খাটের পাশে মেঝেয় বসে আছে। পিউ জেগে উঠেছে, চুপটি করে শুয়ে পিটপিট করে চাইছে।

ডাক্তার পিউকে পরীক্ষা করলেন, তার রিফ্লেক্স দেখলেন। আমি ডাক্তার দেখে দেখে পেকে গেছি, কোন্ ডাক্তার কী ভাবে রোগী পরীক্ষা করেন তা থেকে বোঝা যায় তিনি কী রকম ডাক্তার। দেখলুম বয়সে তরুণ হলেও ইনি বিচক্ষণ ডাক্তার। এঁর পরীক্ষা করার ভঙ্গিতে বেশ একটা সতর্ক আত্মপ্রত্যয় আছে, অথচ আড়ম্বর নেই।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বললেন, বাঃ! খুকি তো সেরে গেছে। আর দু-চার দিন ভালভাবে নার্স করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শঙ্খনাথবাবু বললেন, আর ইঞ্জেকশন দিতে হবে না?

ডাক্তার বললেন, না, ওরাল ওষুধেই চলবে।

তিনি ওষুধ পথ্য এবং পরিচর্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন; যাবার সময় আমার পানে একটু মুচকি হেসে গেলেন।

আমি শঙ্খনাথবাবুকে বললুম, আমিও এবার যাই।

উনি বললেন, আচ্ছা। দিনের বেলাটা আমি সামলে নেব। তুমি কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি এসো প্রিয়দম্বা। আমি ঠিক নটার সময় গাড়ি পাঠাব।

আমাকে কি আর দরকার হবে?

হবে। তিনি পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোেট বার করে আমার হাতে দিলেন।

আচ্ছা, আসব।

নীচে গাড়িবারান্দায় মোটর দাঁড়িয়ে ছিল; আমি নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। শিউসেবক গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেলাম করল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করল।

যেতে যেতে দেখলুম আকাশ এখনও পরিষ্কার হয়নি; পাতলা ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘের মধ্যে দিয়ে পাসে রোদ দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল আজ সকালে পিউয়ের মাকে একবারও দেখিনি। তিনি বোধ হয় এখনও ঘুমুচ্ছেন। মাঝরাত্তির পর্যন্ত নাচলে সকালবেলা ঘুম ভাঙবে কী করে? মানুষের শরীর তো! অথচ শঙ্খনাথবাবু না-ঘুমিয়ে দিব্যি রাত কাটিয়ে দিলেন। লোহার শরীর বোধ হয়।

বাসায় এসে দেখলুম শুক্লা আগেই ফিরেছে, নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে। ঝি বোধ হয় ডাকাডাকি করে চলে গেছে। আমি নিজের ঘরে গিয়ে নার্সের কাপড়চোপড় ছাড়লুম, তারপর স্নান করে শুয়ে পড়লুম।

ঘুম ভাঙল বেলা তখন দুটো। শুক্লা বিছানার পাশে বসে কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে, আমি চোখ মেলতেই জিগ্যেস করল, কোথায় গিয়েছিলি কাল রাত্রে?

বিছানায় উঠে বসে শুক্লাকে সব বললুম। শুনে শুক্লা শঙ্খনাথবাবুর পারিবারিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে কিছু বলল না, ডাক্তার সম্বন্ধে বলল, নেকড়ে বাঘ এখনও তোর আশা ছাড়েনি। সাবধানে থাকিস।

বললুম, দূর! সে বয়স আর নেই।

শুক্লা বলল, কিছু বলা যায় না। পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।–নে ওঠ। রান্না করেছি খাবি চল।

শুক্লার জীবন যে-পথেই চলুক, মনটা তার গোঁড়া।

দুজনে খেতে বসলুম। আজ রাত্রে শুক্লার কাজ নেই, সে বাড়িতেই থাকবে। বোধ হয় ডক্টর দাস আসবেন, শুক্লার মুখ দেখে যেন মনে হচ্ছে।

খাওয়া সেরে ডায়েরি লিখতে বসেছি। রাত্রি নটায় গাড়ি আসবে।

# ১৯ শ্রাবণ।

ঠিক নটার সময় গাড়ি এল। রাত্তিরের খাওয়া সেরে নার্সের সাজপোশাক পরে তৈরি ছিলুম, গাড়িতে উঠে বসলুম।

গাড়ি যখন শঙ্খনাথবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন দেখলুম, তাঁর স্ত্রী সলিলা সেজেগুজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে; বোধহয় গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ সাজপোশাক একেবারে অন্যরকম, আগাগোড়া সাদা। সাদা সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ, গলায় মুক্তোর কণ্ঠী, পায়ে সাদা হাই-হিল জুতো; হাতে চুড়িবালা নেই, কেবল আঙুলে একটি মুনস্টোনের আংটি, চুলে এক থোলো শ্বেতকরবী। সব মিলিয়ে যেন একটি ফুটন্ত রজনীগন্ধার ছড়। আমি গাড়ি থেকে নামতেই সে আমার পানে একটু মিষ্টি হাসির সুগন্ধ বিলিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি পাক খেয়ে বেরিয়ে গেল। আজও নাচের পার্টি নাকি?

শিউসেবক বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, হাসিমুখে বলল, আসুন মিস্। পিউরানী আজ ভাল আছে, দুপুরবেলা খেলা করেছে।

শিউসেবকের সঙ্গে ওপরে চললুম। সে পরিষ্কার করে বাংলা বলে। কলাবতী কিন্তু বাংলা বলতে পারে না।

পিউয়ের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ঘরের মাঝখানে দুর্বাসা মুনির ভঙ্গিতে বুকে হাত বেঁধে শঙ্খনাথবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে। আমাকে দেখেই তিনি ফেটে পড়লেন,—আমার বউ আজও পার্টিতে গেছে, বুঝেছ? কর্নেল হড়বড় সিংয়ের বাড়িতে পার্টি। খাঁটি পাঞ্জাবী কর্নেল, তার ছেলের নাম লেফটেনেন্ট লটপট সিং। এই লটপট সিংয়ের সঙ্গে আমার বউয়ের ভারি ভাব। ভারি স্মার্ট ছোকরা লট্‌পট্‌ সিং, এক টানে এক বোতল হুইস্কি সাবাড় করে দিতে পারে। আরও অনেক গুণ আছে। বুঝলে? কলকাতার যত উচ্চশ্রেণীর যুবক-যুবতী আছে, সব আজ সেখানে গিয়ে জুটেছে। আমার বউ সেখানে না গিয়ে থাকতে পারে।

আমার মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। বললুম, আপনার যখন ইচ্ছে নয় তখন স্ত্রীকে পাঠালেন কেন?

তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, আমি পাঠিয়েছি! তুমি কী বলছ প্রিয়দম্বা! সভ্যসমাজের প্রগতিশীলা মহিলাদের তুমি চেন না। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জেনানা ওরা, ওরা কি স্বামীর অনুমতির তোয়াক্কা রাখে! ওরা নিজের ইচ্ছেয় চলে, নিজের খুশিতে নাচে, নিজের গরজে মিষ্টি কথা বলে। মিষ্টি কথায় কাজ না হয় স্পষ্ট কথা আছে। কে কার কড়ি ধারে!

ব্যাপার বুঝতে দেরি হল না। স্বামীর নিষেধ উপেক্ষা করে সলিলা পার্টিতে গিয়েছে। কিন্তু শঙ্খনাথবাবুর কথায় সায়-উত্তর দিলে কথা বেড়েই যাবে, তাঁর রাগও বাড়বে। আমি আর কোনও কথা না বলে পিউয়ের খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

পিউ জেগে আছে, কিন্তু চুপটি করে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল; চোখ দুটি হাসিতে ভরে উঠল। তারপর সে আমার দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিল।

আমার বুকের মধ্যে যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল। আমি তাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলুম। ফুলের মত হাল্কা মেয়েটা, আমার কাঁধে মাথা রেখে চুপটি করে রইল।

শঙ্খনাথবাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেছে। বিগলিত স্বরে বললেন, পিউ একেবারে সেরে গেছে–না?

বললুম, হ্যাঁ।

আর কোনও ভয় নেই?

না।

তিনি একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি এসেছিলে তাই পিউ এত শিগগির সেরে উঠল। তুমি ভারি পরমন্ত প্রিয়দম্বা।

আমি পিউকে নিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করলুম। মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ডাকলুম, পিউ!

পিউ ঘুমোয়নি, পাখির মত সরু গলায় বলল, উ।

আমি তাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলুম। সে আবার একটু হাসল। হাসিটি একেবারে মায়ের হাসি বসানো। আমি তার খাটের পাশে বসে বললুম, পিউ, তোমার খিদে পেয়েছে?

পিউ ঘাড় নেড়ে বলল, হুঁ!

তাহলে তোমার জন্যে দুধ তৈরি করে আনি? বোতলে দুধ খাবে তো?

পিউয়ের চোখ আমার মুখ থেকে নেমে দোরের কাছে গিয়ে স্থির হল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম কলাবতীর দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

বুঝতে বাকী রইল না পিউ কী খেতে চায়। তবু বললুম, বোতলে দুধ খাবে না? খুব মিষ্টি দুধ, আমি তৈরি করে দেব—অ্যাঁ?

পিউয়ের চোখ কিন্তু কলাবতীর ওপর থেকে নড়ল না। তার ঠোঁট দুটি একটু একটু ফুলতে লাগল, তারপর সে পরিষ্কার মিহি গলায় বলল, দুধ খাব না, কলা খাব।

আমি চোখ তুলে শঙ্খনাথবাবুর পানে চাইলুম, তিনি হা-হা করে হেসে বললেন, কলা খাব মানে। বুঝলে না? বোতলে দুধ খাবে না, কলাবতীর দুধ খাবে।

তখন আর উপায় কী! আমি উঠে গিয়ে চেয়ারে বসলুম, কলাবতী এসে পিউকে খাওয়াতে লাগল। শঙ্খনাথবাবু একটা চেয়ার টেনে আমার কাছে বসলেন, বললেন, তোমার ইচ্ছে নয় পিউ কলাবতীর দুধ খায়—কেমন?

আমি বললুম, দশ মাস বয়সের পর আর দরকার হয় না। ছাড়িয়ে দেওয়াই তো ভাল।

তিনি বললেন, তুমি যখন বলছ তখন নিশ্চয় ঠিক কথা। চেষ্টা করব। কিন্তু পিউ বড় কান্নাকাটি করবে।

বললাম, এখন থাক। একেবারে সেরে উঠুক।

তিনি বললেন, সেই ভাল। তুমি খাওয়া-দাওয়া করে এসেছ তো? যদি না খেয়ে এসে থাক—

আমি খেয়ে এসেছি।

তিনি উসখুস করলেন; মনে হল তিনি যেন আমাকে কোনও প্রশ্ন করতে চান। হঠাৎ বললেন, কী দিয়ে ভাত খেলে?

সভ্যসমাজে এ প্রশ্ন চলে না। কিন্তু আমার রাগ হল না, বরং হাসি এল। বললুম, মুগের ডাল, কুচো চিংড়ির চচ্চড়ি, ইলিশ মাছের ঝোল আর ডিম ভাতে।

শঙ্খনাথবাবু হেসে উঠলেন। প্রাণখোলা সরল হাসি, তাতে বড়মানুষির অবজ্ঞা নেই। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ চুপ করে বইলেন। শেষে একটু করুণ সুরে বললেন, আমিও আগে ওই খেতাম। কিন্তু এখন আর ও হবার জো নেই। আজকাল বাবুর্চির রান্না খেতে হয়। হরদম কালিয়া পোলাও, মটন মুরগি, একেবারে মোগলাই ব্যাপার।

নিশ্বাস ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, আমি খেতে যাচ্ছি। তুমি আসবে না? একটা কাটলেট? একটু পুডিং?

না।

তিনি চলে গেলেন।

পিউ কলাবতীর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমি খাটের পাশে চেয়ার টেনে বসলুম, কলাবতীকে বললুম, তোমাকে আজ আর দরকার নেই, তুমি যাও। সে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

রাত্রিটা একরকম ঠাণ্ডাভাবেই কাটল।

খাওয়া শেষ করে শঙ্খনাথবাবু ঘরে এলেন, প্রকাণ্ড একটা হাই তুললেন। আমি বললুম, আপনি আবার এ ঘরে কেন? যান, শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

তিনি বললেন, আমাকে দরকার হবে না?

না।

আচ্ছা। যদি কিছু দরকার হয় এই বোতাম টিপো, তা হলেই শিউসেবক আসবে। বলে দোরের পাশে বোম দেখালেন।

শিউসেবক বাড়িতেই থাকে?

হ্যাঁ। নীচের তলায় পিছন দিকের চাকরদের থাকবার জায়গা। শিউসেবক, কলাবতী, বাবুর্চি, আরও দুটো চাকর, সবাই সেখানে থাকে। আমি যাই, ঘুমে চোখ ভরে আসছে।

তিনি খাটের ওপর ঝুঁকে পিউয়ের মুখখানি একবার দেখলেন, তারপর আর-একটা হাই তুলে চলে গেলেন।

ঘণ্টাদেড়েক আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। পিউ নিঃশব্দে নিশ্বাস ফেলছে। কী অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটা, হঠাৎ যেন বিশ্বাস হয় না...আমাকে তো চেনে না, অথচ কেমন স্বচ্ছন্দে

আমার কোলে এল। যেন কতকালের চেনা। ওকে কোলে নিয়ে আমারও মনে হল যেন ও একান্তই আপনার; বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। কত বাচ্চাকেই তো নার্স করেছি, কিন্তু এমন কখনও মনে হয়নি। জাদু জানে মেয়েটা।

কিন্তু ওর মা এমন ধিঙ্গী কেন? ঘরে মন বসে না! এমন যার বাড়ি-ঘর, এমন যার মেয়ে, তার ঘরে মন বসে না!...পিউও কি বড় হয়ে মায়ের মত ধিঙ্গী হবে? আশ্চর্য কী, যা দেখবে তাই তো শিখবে। কী জানি বাপু, ভাবতেও খারাপ লাগে।...

দরজার বাইরে খুব মৃদু আওয়াজ পেয়ে সেইদিকে চোখ ফেরালুম। পিউয়ের মা চোরের মত পা টিপে টিপে দোরের সামনে দিয়ে চলে গেল। মেয়ের ঘরে এল না, ঘরের দিকে একবার তাকাল না। ঘড়িতে দেখলুম পৌনে বারোটা। যাক, আজ তবু সকাল সকাল পার্টি থেকে ফিরেছে।

শঙ্খনাথবাবু নিশ্চয় ঘুমিয়েছেন, কারণ গণ্ডগোল চেঁচামেচি কিছু হল না। অনেকক্ষণ কান পেতে রইলুম, কিছু শুনতে পেলুম না।

বসে আছি, কিছু দরকার নেই। একখানা বই আনলে ভাল হত, তবু খানিকটা সময় কাটত। শঙ্খনাথবাবুর বাড়িতে বোধ হয় বইয়ের পাট নেই! কে পড়বে? শঙ্খনাথবাবু সম্ভবত খবরের কাগজ ছাড়া আর-কিছু পড়েন না। আর সলিলা—সে বই পড়ে সময় নষ্ট করবে? এ ধরনের মেয়েরা বই পড়ে না।

রাত্রে আমার আর কোনও কাজ নেই। পিউয়ের যদি ঘুম ভাঙে, সে যদি খেতে চায়, তাকে দুধ তৈরি করে খেতে দেব। পাশের ঘরে সব ব্যবস্থা আছে। একবার গিয়ে দেখে এলে হয়, সব ঠিক আছে কি না! যদি না থাকে শিউসেবককে ডাকতে হবে বোতাম টিপে।

পিউ নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। পা টিপে টিপে উঠে গেলুম। পাশের ঘরটা বোধ হয় আসলে গেস্টরুম, এখন সেখানে পিউয়ের খাবার সরঞ্জাম রাখা হয়েছে। টিনের দুধ, গ্লুকোজের কৌটো, দুধ খাওয়ানোর বোতল, ইলেকট্রিক স্টোভ—সবই মজুত আছে। শিউসেবককে ডাকবার দরকার হবে না।

||||||||| ফিরে এসে বসলুম। পিউয়ের গায়ে আস্তে আস্তে হাত রাখলুম। মেয়েটা যেন মাখনের দলা; ইচ্ছে করে দুহাতে চাই, তারপর বুকে চেপে ধরে চুমু খাই।...কিন্তু রুগীর প্রতি নার্সের এরকম। মনোভাব ভাল নয়। নার্স প্রিয়ংবদা ভৌমিক, পরের সোনা কানে দিও না!

তুমি ভারি পয়মন্ত শঙ্খনাথবাবু আমাকে বলেছিলেন। কথাটা ঘুরে-ফিরে মনে আসছে। পয়মন্ত! কী জানি। অবশ্য আজ পর্যন্ত আমার হাতে একটিও রোগীর মৃত্যু হয়নি। তাকেই কি পয়মন্ত বলে? শঙ্খনাথবাবু যতই অসভ্য আর অশিক্ষিত হোন, তাঁর মন ভাল। সরল সহজ মানুষ। মেয়েকে কী ভালই বাসেন! স্ত্রীকেও হয়তো ভালবাসেন

রাত্রি সাড়ে তিনটে। শঙ্খনাথবাবু দু পেয়ালা চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বললুম, আপনার ঘুম হয়ে গেল?

তিনি পাশে এসে দাঁড়ালেন,—খুব ঘুমিয়েছি। আমার পাঁচ-ছ ঘণ্টার বেশী ঘুম দরকার হয় না।

আমি উঠে তাঁর হাত থেকে চা নিলুম। পিউয়ের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলুম। নিচু গলায় কথা হতে লাগল।

তিনি বললেন, চা কেমন হয়েছে?

বললুম, ভাল। সঙ্গে কিছু খাবে?

দুটো বিস্কুট?

না।

পিউ রাত্তিরে জেগেছিল?

না।

একবার নড়েওনি।

আর বোধ হয় ভয়ের কিছু নেই।

না।

আজ থেকে আবার আমাকে কাজে বেরুতে হবে। সাত দিন কাজের কথা ভাবতে পারিনি।

ভাবলুম তিনি যদি আমাকে কি দিয়ে ভাল খেলে জিগ্যেস করতে পারেন, আমিই বা জিগ্যেস করব না কেন—কী কাজ করেন?

জিগ্যেস করলুম। তিনি অশিষ্ট প্রশ্ন লক্ষ্যই করলেন না, বললেন, ঠিকেদারি। ইট আর কাঠের ব্যবসা।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ইট আর কাঠের ব্যবসায় কত টাকা রোজগার করেন শঙ্খনাথবাবু।

তিনি বললেন, আজ থেকে বেরুতেই হবে। নিজের কাজ নিজে না দেখলে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খায়।

আমি বললুম, আজ থেকে আমাকেও দরকার হবে না।

তিনি চোখ বিস্ফারিত করে আমার পানে চেয়ে রইলেন,—দরকার হবে না। তুমি না এলে রাত্তিরে পিউকে দেখবে কে?

বললুম, যে এতদিন দেখেছে সে দেখবে। কলাবতী দেখবে। পিউ তো এখন সেরে গেছে।

সেরে গেলেও কলাবতীর হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না।

তাহলে আপনি মেয়ের জন্যে গভর্নেস্ রাখুন।

গভর্নেস্। না প্রিয়দম্বা, ওসব সাহেবী কাণ্ডকারখানা আর নয়, এমনিতেই সাহেবিয়ানার ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমি একজন ভালগোছের ঝিয়ের তল্লাশ করছি। যতদিন না পাই, তুমি এসো। লক্ষ্মীটি। তুমি না এলে রত্তিরে আমি ঘুমুতে পারব না। শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর বড় করুণ শোনাল। যে-পুরুষ স্ত্রীর ওপর নির্ভর করতে পারে না তার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়।

একটু হেসে বললুম, মিছিমিছি পঞ্চাশ টাকা রোজ খরচ করবেন?

তিনি অবহেলাভরে বললেন, করলেমই বা। আমি বছরে সওয়া লাখ দেড় লাখ টাকা রোজগার করি। ও আমার গায়ে লাগে না।

সওয়া লাখ—দেড় লাখ। ইটকাঠের ব্যবসায়। আতি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি আমার হাত থেকে খালি পেয়ালা নিয়ে সাগ্রহে বললেন, তাহলে রাজী? যতদিন ভাল ঝি না পাই ততদিন আসবে?

আসব।

শঙ্খনাথবাবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে পেয়ালা রাখতে চলে গেলেন। আমি আবার গিয়ে বসলুম। এই মেয়েটাকেই আমার ভয়। জাদু জানে ও, আমাকে মোহের জালে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে।

ছোট ছেলেমেয়ে কার না ভাল লাগে? বিশেষত যদি পিউয়ের মত সুন্দর হয়। কিন্তু এ তা নয়। পিউকে দেখে অবধি আমার মনের মধ্যে কী একটা ঘটতে আরম্ভ করেছে। ...পঁচিশ বছর বয়সে এ সব কেন? যা হবার নয় তার জন্যে লোভ কেন? প্রিয়ংবদা ভৌমিক, সাবধান। পরের সোনা দিও না কানে—

বেলা আটটার সময় ডাক্তার এলেন। পিউকে পরীক্ষা করে বললেন, আর ওষুধ খাওয়াবার দরকার নেই। যে শিশিটা চলছে সেটা শেষ হলেই বন্ধ করে দেবেন। কাল থেকে আমারও আর আসবার দরকার নেই।

শঙ্খনাথবাবু বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন, বললেন, ধন্যবাদ ডাক্তার। প্রিয়ম্বাকে আমি আরও কয়েকদিন আসতে বলেছি।

ডাক্তার মুচকি হেসে আমার পানে তাকালেন,—বেশ তো। তাঁর হাসির আড়ালে একটা গোপন প্রশ্ন রয়েছে মনে হল।

শঙ্খনাথবাবু বললেন, তাহলে চল প্রিয়দম্বা, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি কাজে চলে যাব।

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা, আমি তাহলে চলি।

ডাক্তার মুচকি হেসে চলে গেলেন। আমি পিউয়ের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। পিউ জেগে আছে; আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দুহাত বাড়িয়ে দিল। আমি তাকে কোলে তুলে নিলুম।

সে একটু আদুরে আদুরে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, কলা খাব। যেন আমার অনুমতি চাইছে।

আমি হেসে উঠলুম, কলা খাবে তো আমার কাছে এসেছ কেন? যাও কলার কাছে।

কলাবতী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে হাত বাড়াল। পিউ কিন্তু তখনই তার কাছে গেল না; আমার গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুক করে একটু শব্দ করল। বোধ হয় অনুমতির জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাল।

শম্বনাথবাবু হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমার চোখে কিন্তু জল এল। আমি আর গালে তাড়াতাড়ি একটু চুমু খেয়ে তাকে কলাবতীর কোলে দিলুম। শঙ্খনাথবাবু তখনও হেসেই চলেছেন।

এতে হাসির কী আছে এত? একটু বিরক্ত হয়েই বললুম, চলুন এবার।

চল।

মোটরে আসতে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল।

আমরা দুজনেই মোটরের পিছনের সীটে বসেছিলুম; তিনি এক কোণে, আমি অন্য কোণে। তিনি আমাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে একটু অনুনয়ের সুরে বললেন, প্রিয়দম্বা, তুমি রাগ করেছ?

আমি রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইলুম। রাগ অবশ্য আমি করিনি, কার ওপরেই বা রাগ করব? কিন্তু মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। ডাক্তারের

সামনে আমাকে প্রিয়দম্বা বলে না ডাকলেই কি চলত না? তারপর, পিউ যদি আমাকে চুমু খেয়েই থাকে তাতে হাসির কী আছে! কী রকম যেন সব!

শঙ্খনাথবাবু আবার বলবেন, তুমি রাগ করো না প্রিয়দম্বা। পিউয়ের ওই স্বভাব, যাকে ওর ভাল লাগে তাকেই চুমু খায়।

কী উল্টো-বোঝা মানুষ। আমি যেন ওই জন্যেই রাগ করেছি। বললাম, পিউ একরত্তি মেয়ে, ও যাই করুক দোষ হয় না। কিন্তু আপনি তো ছেলেমানুষ নন, আপনি অমন করেন কেন?

তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল,—আমি কী করেছি?

এইবার সত্যিসত্যি আমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। বললুম, আপনি আমায় প্রিয়দম্বা বলেন কেন? মিস ভৌমিক বলতে পারেন না?

তিনি হেসে উঠলেন, এই জন্যে রাগ? কিন্তু মিস্ ভৌমিক বলব কেন? ওসব বিলিতি ঢঙ আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া মিস্ ভৌমিক বললেই মনে হয় পঞ্চাশ বছরের বুড়ি। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে নাম ধরে ডাকাই তো ভাল।

রাগ আরও বেড়ে গেল, বললুম, আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই, পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় হতে পারেন, কিন্তু আমাকে তুমি বলে ডাকবার অধিকার আপনার নেই।

তিনি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, বললেন, তবে কী বলে ডাকব?

আপনি বললেন। আমি আপনাকে আপনি বলি, আপনি আমাকে তুমি বলবেন কেন?

কিন্তু কিন্তু কমবয়সী মেয়েকে আপনি বলব কী করে? ভদ্রসমাজে বলে শুনেছি; ঘাট বছরের বুড়ো আঠারো বছরের মেয়েকে আপনি বলে। কিন্তু আমার যে অভ্যেস নেই।

তবে অভ্যেস করুন। ভদ্রসমাজে থাকতে গেলে ভদ্র ব্যবহার অভ্যেস করতে হয়।

তিনি কিছুক্ষণ ঘাড় গুজে চুপ করে রইলেন, ভাবলুম খোঁচা খেয়ে আহত হয়েছেন। তারপরই তিনি মুখ তুলে বললেন, আচ্ছা, এক কাজ কর না। আমি তোমাকে তুমি বলি, তুমিও আমাকে তুমি বল। তাহলে তো আর কোনও গোল থাকবে না। কেমন, বলবে?

তখনও আমার রাগ পড়েনি, বললুম, বলবই তো।

তিনি খুশি হয়ে বললেন, বেশ বেশ। লোকে শুনলে মনে করবে আমি তোমার পিসে-মেসো গোছের আত্মীয়। কেউ কিছু মনে করবে না।

গাড়ি এসে আমার বাসার সামনে থামল। আমি নামবার উপক্রম করছি, তিনি আমার হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, ঠিক নটার সময় গাড়ি আসবে। তৈরি থেকো।

আমি নেমে পড়লুম। তিনি গলা বাড়িয়ে বাসাটা এক নজরে দেখে নিলেন। তারপর গাড়ি চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আমার আর রাগ রইল না, মনটা হঠাৎ যেন হেসে লুটিয়ে পড়ল। কী ছেলেমানুষিই করলুম।

শুক্লা বোধ হয় ওপরের বারান্দা থেকে গাড়ি আসতে দেখেছিল, সিঁড়ির দরজা খুলে দিল। তার মুখ দেখে থমকে গেলুম। মুখ শুকনো, চোখ ছলছল করছে। মুখে হাসি টেনে এনে বলল, এত দেরি হল যে? সকালবেলা কিছু খেয়েছিস?

বললুম, খেয়েছি। জামাইবাবু এসেছিলেন?

সে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আয়, চা তৈরি করে তোর পথ চেয়ে আছি।

দুজনে বসবার ঘরে গেলুম। শুক্লা এক প্লেট নিমকি ভেজে চা ভিজিয়ে টি-পটে টি-কোজি ঢাকা দিয়ে রেখেছে। আমি নিমকি নিলুম না, এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে শুক্লার সামনে বসলুম, বললুম, এবার বল কী হয়েছে।

শুক্লা আর আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করল না, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ভাই, দুর্ভাবনায় কাল সারা রাত্তির ঘুমুতে পারিনি।

শুক্লা তখন আস্তে আস্তে সব বলল। কাল রাত্রে ডক্টর দাস আন্দাজ পৌনে এগারোটার সময় এসেছিলেন। খাওয়াদাওয়া সবে সারা হয়েছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। শুক্লা টেলিফোন ধরল। অচেনা পুরুষের গলায় কে তাকে প্রশ্ন করল, ডক্টর দাস আছেন?

শুক্লা একেবারে কাঠ হয়ে গেল। কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বলল, কে ডক্টর দাস?

টেলিফোনে উত্তর এল, ডক্টর নিরঞ্জন দাস, গাইনকোলজিস্ট।

শুক্লা ইতিমধ্যে একটু সামলে নিয়েছে, বলল, তিনি তো এখানে নেই। আপনি কে?

টেলিফোনে একটু হাসির আওয়াজ এল। তারপর আর সাড়াশব্দ নেই, যে ফোন করছিল সে ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

শুক্লা ডক্টর দাসকে বলল। শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন, কেউ জানতে পেরেছে। হয়তো খোঁজ নিতে আসবে।

তিনি চলে যাবার পর শুক্লা সারারাত জেগেই কাটিয়েছে। কিন্তু কেউ আসেনি, টেলিফোনও করেনি।

যে লোকটা টেলিফোন করেছিল তার গলার স্বর আর কথা বলবার ভঙ্গি থেকে তাকে ভদ্রশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। কে লোকটা? হয়তো ডক্টর দাসের কোনও গুপ্তশত্রু জানতে পেরেছে তিনি রাত্রে এখানে আসেন। কিন্তু টেলিফোন করার মানে কী? তার যদি শত্রুতা করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এখানে টেলিফোন না করে ডক্টর দাসের স্ত্রীকে টেলিফোন করলেই তো পারত। হয়তো এখানে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল, তারপর ডক্টর দাসের স্ত্রীকে খবর দিয়েছে। এখন সেই রণরঙ্গিণী মহিলাটি যদি এখানে এসে উপস্থিত হন তাহলেই চরম।

কিন্তু কিছু করবার নেই, চুপটি করে দুর্যোগের প্রতীক্ষা করতে হবে। উঃ, কী ছোটলোক এই মানুষ জাতটা! তাদের সংসর্গে এক দণ্ড শান্তি নেই। এর চেয়ে বাঘভাল্লুকের সঙ্গে বনে বাস করা ভাল।

শুক্লা ম্লান হেসে বলল, ভেবে আর লাভ কী, যা হবার তাই হবে। তুই যা, স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নে।

মনটা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে কিছু ভাল লাগছিল না। চায়ের পেয়ালা রেখে উঠে দাঁড়ালুম। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। শুক্লা টেলিফোনের কাছে ছিল, সে যন্ত্রটি তুলে নিয়ে বলল, হালো। তারপরই তার চোখ দুটো দপ করে উঠল। কিছুক্ষণ কথা শুনে সে নিঃশব্দে টেলিফোন আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, অর্থাৎ আমার কল। কিন্তু তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে রইল।

টেলিফোন কানের কাছে ধরতেই আওয়াজ এলমি ভৌমিক? আমার গলা বোধ হয় চিনতে পারছেন না? ডক্টর কর—মন্মথ কর।

ওঃ বলে আর কিছু বলতে পারলাম না, মুখে কথা জোগালো না। হঠাৎ বুক ঢিবঢিব করে উঠল। ভেবেছিলুম নেকড়ে বাঘ আর অজগর সাপের ভয় কেটে গেছে। কাটেনি এখনও।

ডক্টর কর সরল কণ্ঠে বললেন, শঙ্খনাথবাবুর বাড়িতে আপনার সঙ্গে ভাল করে কথা বলার সুযোগ হল না, মিস্ ভৌমিক। শঙ্খনাথবাবু লোকটি বেশ ভাল, টাকাকড়ির ব্যাপারে মুক্তহস্ত। আপনি প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন তো? আমিই আপনাকে এগেজ করিয়েছিলাম, আমার এ বিষয়ে একটা দায়িত্ব আছে; তাই জিগ্যেস করছি।

বললাম, হ্যাঁ, টাকা পাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

তিনি বললেন, না না, ধন্যবাদ কিসের। আপনাকে সেই ছাত্রাবস্থা থেকে চিনি, এ তো আমার কর্তব্য। কিন্তু ওকথা থাক। মিস্ ভৌমিক, মনে আছে, অনেক দিন আগে আমি আপনাকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলাম? আপনি তখন নেমন্তন্ন রক্ষে করেননি। বাট ইট

নেভার টু লেট টু মেণ্ড। আসুন না একদিন একসঙ্গে চা খাওয়া যাক। কী বলেন? আপনিও আর ছেলেমানুষ নয়, আমিও একজন দায়িত্বশীল ডাক্তার। সুতরাং কেউ কিছু মনে করবে না।

আমি তোতলা হয়ে গেলুম,—তা-তা—নেমন্তন্নর জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখন তো আমার ছুটি নেই ডক্টর—মানে–সারারাত জাগতে হয়—

ডক্টর কর শান্তস্বরে বললেন, বেশ তো, তাড়া নেই। আপনার যখন ছুটি থাকবে তখন হবে। দু-চার দিন পরে আবার আমি ফোন করব। আপনি যাঁর সঙ্গে থাকেন তিনি বুঝি আপনার বান্ধবী? কী নাম বলেছিলেন মনে পড়ছে না।

শুক্লা সেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। তিনিও তো নার্স। বিবাহিতা কি?

আমার গলা শুকিয়ে গেল। বললুম, না।

তিনি বললেন, তাঁকেও আপনার সঙ্গে নেমন্তন্ন করতাম। কিন্তু জানেন তো—টু ইজ কম্পানি, থ্র ইজ এ ক্রাউড। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। নমস্কার।

ফোন রেখে দিলুম। শুক্লা এতক্ষণ একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে ছিল, প্রশ্ন করল, মন্মথ কর?

আমি ঘাড় নাড়লুম। সে আবার প্রশ্ন করল, চায়ের নেমন্তন্ন?

আমি আবার ঘাড় নেড়ে বললুম, তুই ফোন তুলে অমন চমকে উঠেছিলি কেন?

সে খানিক আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে শুকনো মুখে বলল, আজ মন্মথ করের গলা শুনে মনে হল কাল রাত্রে যে ফোনে কথা বলেছিল তারই গলা।

## ২০ শ্রাবণ।

কাল ডায়েরি লেখা শেষ হল না।

শুক্লার সঙ্গে ওই কথা নিয়ে তোলাপাড়া করতে করতে বেলা বেড়ে গেল, তখন একেবারে নাওয়া-খাওয়া সেরে শুতে গেলুম। শুক্লার আজ দুপুরে কাজ, সে বেরিয়ে গেল। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, কাল যে ফোন করেছিল সে যদি মন্মথ কর হয় তবে তার মতলব কী? ব্ল্যাকমেল?...

ঘুমিয়ে উঠে ডায়েরি লিখতে বসেছিলুম, লেখা শেষ হবার আগেই দেখি আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলুম। ঠিক নটার সময় গাড়ি এল।

গিয়ে দেখি, পিউয়ের ঘরে শঙ্খনাথবাবু আছেন, দোরের পাশে কলাবতী হাঁটু উঁচু করে বসে আছে; পিউ বিছানায় বসে পুতুল-নিলে খেলা করছে। আমাকে দেখে শঙ্খনাথবাবু বললেন, দেখ একবার কাণ্ড। পিউ এখনও ঘুমোয়নি।

জিগ্যেস করলুম, খেয়েছে?

কলাবতী দাঁত বার করে ঘাড় নাড়ল। আমি তখন পিউয়ের কাছে গিয়ে একটু ধমকের স্বরে বললুম, পিউ, তুমি এখনও ঘুমোওনি?

পিউ আমার পানে মুখ তুলে মিষ্টিমিষ্টি দুই-দুষ্ট হাসি হাসল, কচি দাঁতগুলি ঝিকমিক করে উঠল। তার এই হাসি দেখে বুঝলুম তার মনের ওপর থেকে রোগের ছায়া সরে গেছে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে।

তারপর সে পুতুল ফেলে আমার দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিল।

কোলে তুলে নিলুম। সে আমার গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রাখল। ...মেয়েটাকে কোলে নিলে বুক জুড়িয়ে যায়।

তাকে নিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সে তখনও জেগে আছে, কিন্তু চোখ দুটো ঘুমে ভরে উঠেছে। পাখির মত মৃদু কূজন করে বলল, ঘুমুই?

ঘুমোও বলে আমি তার গায়ে হাত রাখলুম।

আশ্চর্য, এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি বিছানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শঙ্খনাথবাবুর দিকে চাইলুম; তিনি ফিসফিস করে বললেন, পিউ তোমার জন্যেই জেগে ছিল।

এই সময় দোরের কাছে এক অপরূপ মূর্তির আবির্ভাব হল। পিউয়ের মা যে আজ বাড়িতেই আছে তা জানতুম না। দেখলুম আটপৌরে ঘরোয়া পোশাকেও তাকে কম মানায়নি। সাদাসিধে ঢিলেঢালা সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ, তার ওপর একটি জাপানী কিমোনো, পায়ে লাল মখমলের স্লিপার, চুলগুলি একটু শিথিল। গায়ে গয়না নেই, কেবল গলার কণ্ঠিতে কাঁইবিচির মত একটি চুনি ধকধক করছে।

এত রূপ। শুক্লার মুখে গান শুনেছি–ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়। এ যেন তাই। কিন্তু গুণ কি একটিও নেই?

শঙ্খনাথবাবুর পানে আড়চোখে তাকালাম। তিনিও সলিলার পানে চেয়ে আছেন; তাঁর চোখে আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটা দ্বন্দ্ব চলছে। তৃষ্ণা আর বিতৃষ্ণা একসঙ্গে। কী অদ্ভুত এঁদের সম্পর্ক।

আমার কাজ আছে–নীচে যাচ্ছি—এই বলে শঙ্খনাথবাবু চলে গেলেন। সলিলা তাঁর পানে একবার তাকালও না।

আজ সে বেড়াতে বেরোয়নি কেন কে জানে। হয়তো নেচে নেচে হাঁপিয়ে পড়েছে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

শঙ্খনাথবাবু বেরিয়ে যাবার পর সলিলা পিউয়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, হাসিহাসি মুখে পিউয়ের পানে একবার তাকিয়ে বলল, পিউ ঘুমিয়েছে?

বললুম, হ্যাঁ, এই ঘুমোল।

সলিলা আমার পানে প্রশংসা-ভরা চোখে চাইল, একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, কী সুন্দর আপনার জীবন! শিশুর সেবা! তার কথাগুলি মুখে মিলিয়ে গেল।

শুধু শিশু নয়, দরকার হলে বৃদ্ধবৃদ্ধাদেরও সেবা করে থাকি—একথা আর বললুম না। এবং আমার কর্মজীবনে সুন্দর যদি কিছু থাকে তা সম্পূর্ণ আকস্মিক, একথা বলেও কোনও লাভ নেই। বললুম, সুন্দর কি না জানি না, কিন্তু আমার ভাল লাগে।

সলিলার চোখের প্রশংসা আরও গাঢ় হল, সে বলল, আপনাকে হিংসে হয়। মনে মনে আশ্চর্য হলুম। সলিলা আমাকে হিংসে করে! কিন্তু আসল কথাটা কী? আমার মত সামান্য নার্সের কাছে লক্ষপতির স্ত্রী সলিলা কী চায়? হয়তো কিছুই চায় না, কথা কইবার

একজন লোক চায়। কিংবা অপরিচিতের কাছে, নিজেকে ভাল মেয়ে প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছে মেয়েদের স্বাভাবিক ধর্ম, হয়তো সলিলা সেই চেষ্টাই করছে।

সে বলল, আচ্ছা, আপনার সত্যিকার নামটি কী বলুন তো? শঙ্খ-ডার্লিং কী একটা অদ্ভুত কথা বলে–

বললুম, প্রিয়দম্বা। আমার সত্যিকার নাম প্রিয়ংবদা।

সে খিলখিল করে হেসে উঠল—প্রিয়ংবদাকে প্রিয়দম্বা বলে! পুওর শঙ্খ, হাউ ফানি হি ইজ।

মনে মনে ভাবলুম, ফানি বইকি, ভীষণ ফানি। কিন্তু তার চেয়েও ফানি, তুমি স্বামীকে শঙ্খ-ডার্লিং বল।

জিগ্যেস করলুম, মাফ করবেন, আপনি কি বিলেতে মানুষ হয়েছেন?

সলিলা মুখখানি করুণ করে বলল, বিলেত যাওয়া আর হল কই। এত যাবার ইচ্ছে, কিন্তু শঙ্খর মত নেই! হ্যাজব্যান্ড আর ফানি, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক?

হেসে বললুম, জানি না। আমার বিয়ে হয়নি।

এই সময় কলাবতীর ওপর চোখ পড়ল। সে দোরের পাশে হাঁটু তুলে বসে সলিলার পানে তাকিয়ে আছে। একটা দাসীর চোখে গৃহস্বামিনীর প্রতি এতখানি ঘৃণা আর অবজ্ঞা আমি আগে দেখিনি, দেখলে চমকে উঠতে হয়।

সলিলার কিন্তু সেদিকে নজর ছিল না, সে বলল, বিয়ে হয়নি। হাউ লাকি ইউ আর। আসুন না আমার ঘরে, খানিক বসে গল্প করা যাক।

বললুম, কিন্তু পিউ—

কলাবতী ততক্ষণ পিউকে দেখবে।

পিউ ঘুমুচ্ছে, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে হাসি-গল্প করলে সে জেগে উঠতে পারে। বললুম, চলুন।

কলাবতীকে ডেকে বললুম, তুমি পিউয়ের কাছে একটু থাক, আমি আসছি।

আসুন বলে সলিলা এগিয়ে চলল, আমি পিছু পিছু গেলুম। দেখাই যাক না ওর মনে আরও কী আছে।

সলিলা আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। বারান্দার শেষ প্রান্তে ঘরটি, মৃদু নৈশ-দীপ জ্বলছে। ঘুম-নগরের রাজকুমারী যে-ঘরে শুয়ে ঘুমুতেন, এ যেন সেই ঘর। সলিলা সুইচ টিপে কয়েকটা উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দিল, ঘরটি ঝলমল করে উঠল।

চৌকশ ঘর, লম্বায় চওড়ায় বোধ হয় বিশ ফুট। ঝকঝকে নতুন আসবাব দিয়ে সাজান। প্রত্যেক দেয়ালে বড় বড় আয়না, তা ছাড়া একটি অপূর্ব ড্রেসিং-টেবিল। ঘরের মাঝখানে খাট। কিন্তু জোড়া-খাট নয়, একজনের শোবার মত খাট। বিছানায় পুরু সিল্কের বেড়কভার পাতা।

ঘরের দুপাশে দুটি পদা-ঢাকা দোর। ঘর দুটিতে কী আছে দেখতে পেলুম না; একটি বোধহয় বাথরুম, অন্যটি হয়তো শঙ্খনাথবাবুর শোবার ঘর।

ড্রেসিং-টেবিলের কাছে কয়েকটি গদিমোড়া উঁচু তাকিয়ার মত আসন রয়েছে; সলিলা একটিতে আমাকে বসতে বলল, আর একটিতে নিজে বসে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় নিজের মুখ একবার দেখে নিল; হাসিমুখে বলল, এটা আমার শোবার ঘর।

তা না বললেও চলত। তবু এটা শঙ্খনাথবাবুরও শোবার ঘর কি না তাই জানবার জন্যে মন উসখুস করছে। কিন্তু জিগ্যেস করা তো যায় না।

বললুম, সুন্দর আপনার ঘরটি।

সে তৃপ্তি-ভরা চোখে একবার ঘরের চারিদিকে তাকাল, বলল, মনের মত করে সাজাতে কী কম খরচ হয়েছে! দশটি হাজার টাকা।

তা হবে। আমি কেমন করে জানব! বললুম, টাকা থাকলে ভাল বাড়ি করা যায়, সাধ মিটিয়ে বাড়ি সাজান যায়।

কথাটা সলিলার বোধহয় খুব মনঃপূত হল না, সে একটু বিমনা হয়ে বলল, তা হয়তো যায়। কিন্তু সব সাধ কী টাকায় মেটে?

খুবই উচ্চাঙ্গের কথা। কিন্তু সলিলার কোন্ সাধটা মেটেনি জানবার জন্যে ভুরু তুলে তার পানে চাইলুম। সে বলল, টাকায় কি স্বাধীনতার সাধ মেটে? ধরুন না কেন আপনি। আপনার স্বাধীনতা আছে, যখন যা ইচ্ছে করতে পারেন। সবাই কি তা পারে?

ও, ব্যথা তবে ওইখানে। স্বাধীনতার অভাব। স্বামীর টাকায় বড়মানুষি করব, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় চলব! যখন যা ইচ্ছে করতে পারাটাই স্বাধীনতা। বললুম, আমার স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু যখন যা ইচ্ছে করতে পারি না। তার জন্যে টাকা চাই। ভগবান বোধহয় সকলের সব সাধ মেটাতে ভালবাসেন না।

আমার দিকে একটা বাঁকা কটাক্ষ হেনে সে আয়নার দিকে চোখ ফেরাল, তাচ্ছিল্যভরে বলল, যাকগে ওসব কথা, মন খারাপ করে লাভ কি? আমার চুলগুলো কি বিশ্রী হয়ে আছে।

সে উঠে গিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার মুখোমুখি বসল, চুলগুলোকে আরও একটু আলগা করে দিয়ে হাল্কাভাবে বুরুশ চালাতে লাগল। চুল খুব লম্বা নয়, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা; কিন্তু রেশমের মত নরম আর উজ্জ্বল।

আমি বসে বসে তার চুলের প্রসাধন দেখতে লাগলুম। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর নানা জাতের নানা রঙের শিশি-বোতল কৌটো সাজান; তেল সেন্ট ক্রীম পাউডার, আরও কত কী। যা কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু একটি জিনিস সেখানে নেই; পিউ কিংবা শঙ্খনাথবাবুর ফটোগ্রাফ নেই। ঘরে কোথাও স্বামী বা মেয়ের ছবি নেই; ঘরে স্বামীর বা মেয়ের ছবি রাখেনি সলিলা। কী জানি, যারা সর্বদা চোখের সামনে রয়েছে তাদের ছবি দরকার নেই বলেই বোধহয় রাখেনি। শুনেছি ড্রেসিং-টেবিলে প্রিয়জনের ছবি রাখা বিলাতী রীতি।

আর-একটি জিনিস নেই। সিঁদুরকৌটো। আগেও লক্ষ্য করেছিলুম সলিলা সিঁথিতে সিঁদুর পরে। টেবিলে গালে মাখাবার রুজ আছে, ঠোঁটে লাগাবার সোনা বাঁধানো লিপস্টিক আছে; কিন্তু সিঁদুরকৌটো নেই। ওদের প্রগতিশীল সমাজে সিদুর পরা বোধহয় ঘোর কুসংস্কার।

চুল বুরুশ করা শেষ হলে সলিলা টেবিল থেকে একটি সেন্টের শিশি তুলে নিয়ে তার কাচের ছিপি খুলে গন্ধ শুকলো, তারপর আয়নার ভিতর দিয়ে আমার পানে চেয়ে বলল, দেখি আপনার রুমাল!

ভাগ্যে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে একটা পাট-না-ভাঙা রুমাল ছিল, বার করে দিলুম। সলিলা সেটাতে এসেন্সের ছিটে দিয়ে বলল, এবার শুকে দেখুন। কেমন গন্ধ?

সত্যি কী গন্ধ! অতি মৃদু গন্ধ, কিন্তু নেশা লেগে যায়; মনে হয় বসন্তের সমস্ত ফুল ওই শিশির মধ্যে তাদের মধু ঢেলে দিয়েছে। বললুম, অপূর্ব গন্ধ।

সলিলা হেসে আমার দিকে ফিরল, শিশিটি দুই আঙুলে তুলে ধরে বলল, কত দাম জানেন? এই শিশিটির দাম আড়াই শো টাকা।

হবেও বা। কিন্তু দাম শুনে গন্ধের মাধুর্য যেন কমে গেল। সলিলা মৃদু হেসে বলল, আমার একটি বন্ধু উপহার দিয়েছে।

বন্ধু! নিশ্চয় পুরুষ বন্ধু। মেয়ে বন্ধু এত দামী জিনিস উপহার দেবে না; অন্তত ওদের সমাজের মেয়ে দেবে না। আমি হেসে ঘাড় নাড়লুম। শঙ্খনাথবাবুর মনের ভাব কতকটা যেন বুঝতে পারছি।

সলিলা হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আপনি তো স্বাধীন, আপনার নিশ্চয় অনেক বন্ধু আছে?

স্বাধীনতার সঙ্গে বন্ধুর নিশ্চয় গাঢ় সম্পর্ক আছে। আমি সাবধানে প্রশ্ন করলুম, কোন্ বন্ধুর কথা বলছেন? পুরুষ বন্ধু? না মেয়ে বন্ধু? আমার একটি বান্ধবী আছে। তার নাম শুক্লা–

না, না, পুরুষ বন্ধু। মানে ইয়ং মেন—

আমি দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললুম, ওরকম বন্ধু আমার একটিও নেই।

অবাক হয়ে সলিলা বলল, একটিও না?

একটিও না। তবে একজন পরম বন্ধু আছেন, তাঁর বয়স কিন্তু চল্লিশের ওপর। তিনি কোনদিন আমাকে চায়ের নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেননি, সিনেমা দেখতেও নিয়ে যাননি।

সলিলা চুক্ষ বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল, বোধহয় বিশ্বাস করল না। কিন্তু—শুনেছি-নার্সদের সঙ্গে ইয়ং ডক্টরদের ভাব-সাব থাকে আপনি তো দেখতে শুনতে ভালই কথাটা ঠিক রুচিসম্মত হল না ভেবেই সে বোধহয় থেমে গেল।

একজন ইয়ং ডক্টর ভাব-সাব করবার চেষ্টা করেছিলেন, এখনও করছেন; কিন্তু সুবিধে করতে পারছেন না। আচ্ছা, এবার পিউয়ের কাছেই যাই। আপনার বোধহয় ঘুমুবার সময় হল। বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

সলিলাও উঠল। বলল, না না, তার এখনও ঢের দেরি। আসুন, আমার ড্রেসিংরুম দেখবেন না?

নিরুপায় হয়ে বললুম, চলুন দেখি।

সলিলার স্বাধীনতার সাধ মেটেনি বলেই বোধহয় আমাকে তার ঐশ্বর্য দেখিয়ে বড়মানুষির সাধ মেটাতে চায়। যার সারা অঙ্গে এত রূপ তার মন এত খেলো কেন? সেখানে কি এতটুকু লাবণ্য থাকতে নেই?

পর্দা সরিয়ে সলিলা আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি শোবার ঘরের চেয়ে ছোট। দেয়ালের গায়ে সারি সারি ওয়াড্রোব, সবগুলির কপাটে আয়না লাগান। একটা দেয়ালে লম্বা তাকের ওপর প্রায় তিরিশ জোড়া জুতো। কত রঙের কত ঢঙের জুতো; লাল সাদা নীল সোনালী; কোনওটা হাই-হিল, কোনওটা হিললেস, কোনওটা নাচের পাম্প। জুতোর বাহার দেখেই চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

তারপর সলিলা একে একে ওয়াড্রোবগুলি খুলে খুলে আমাকে দেখাতে লাগল। কোনওটিতে শাড়ি ব্লাউজ, কোনওটিতে শালোয়ার পায়জামা ওড়না; অন্তর্বাস বহির্বাস, কাঁচুলি ব্রাসেয়ার, আরও কত কী। বলে শেষ করা যায় না।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি, তবু মনটা ছটফট করছে। পরের ঐশ্বর্য দেখে আমার কী লাভ? এসব জামাকাপড় পোশাক পরিচ্ছদ আমি তো কোনওদিন কিনতে পারব না। এসব জিনিস আমার কাছে আকাশের চাঁদের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য।

আয়নার ওপর ছায়া পড়ল। শঙ্খনাথবাবু দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। সলিলাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, চট করে ওয়াড্রোবের কপাট বন্ধ করে বলল, চলুন চলুন, দেখা হয়েছে। কী-ইবা দেখবার আছে, সামান্য দু-চারটে কাপড় বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শঙ্খনাথবাবু বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে তার পিছন পিছন বেরুলেন। আমি তাঁর পিছনে বেরুলুম। একটা দাম্পত্য দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছে। আমি আর দাঁড়ালুম না, সোজা গিয়ে পিউয়ের পাশে বসলুম। কলাবতী মেঝেয় বসে ঢুলছিল, তাকে বললুম, তুমি এবার যাও। সে চলে গেল।

কান খাড়া করে শুনছি। শোবার ঘর থেকে মিহি আর মোটা গলার ডুয়েট আসছে, কিন্তু কথাগুলো ধরা যাচ্ছে না। শঙ্খনাথবাবু চটলেন কেন, সলিলাই বা তাঁকে দেখে ড্রেসিংরুম থেকে অমনভাবে পালাল কেন? শঙ্খনাথবাবু কি পছন্দ করেন না যে সলিলা তার কাপড়-চোপড় অন্যকে দেখায়? কেন পছন্দ করেন না?

পনেরো মিনিট পরে শঙ্খনাথবাবু এলেন। পিউয়ের খাটের পাশে বসে গম্ভীরমুখে আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে বললেন, প্রিয়দম্বা, তুমি কিছু মনে কোর না, নিজের জাঁক দেখানো সলিলার অভ্যেস।

তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলুম। চাষা-মনিষ্যির মনে জাঁক দেখানো সম্বন্ধে সংকোচ আছে তাহলে। বললুম, সব মেয়েই জাঁক দেখাতে ভালবাসে, নিজের গয়না কাপড় দেখাতে ভালবাসে। এতে মনে করার কী আছে?

তিনি বললেন, তুমি দেখাতে ভালবাস?

আমার থাকলে ভালবাসতুম।

হুঁ–বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; আর কোনও কথা বললেন না, পিউয়ের পানে একবার চেয়ে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমার নিশি-জাগরণ আরম্ভ হল। আজও বই আনতে ভুলে গেছি। বসে বসে ভাবছি...এ ভাবে আর কতদিন চলবে? সুস্থ মেয়েকে রাত জেগে পাহারা দেওয়া কি নার্সের কাজ?...সলিলা...মেয়ের কথা ভাবে না, স্বামীর কথা ভাবে না...এত পেয়েও তবু তৃষ্ণার শেষ নেই। সে নির্বোধ নয়, বুদ্ধি। আছে; কিন্তু তার বুদ্ধিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অন্ধ ভোগতৃষ্ণা...এর শেষ কোথায়? চিরদিন তো রূপযৌবন থাকবে না, তখন ও কী করবে?...আর শঙ্খনাথবাবু? গরিবের ছেলে, নিজের চেষ্টায় বড়মানুষ হয়েছেন; কিন্তু মন

মধ্যবিত্ত রয়ে গেছে। সাদাসিধে আটপৌরে মন, এখনও বড়মানুষির আঁচ মনে লাগেনি। কিন্তু লাগতে কতক্ষণ!

পিউ একটু উসখুস করল। তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলুম, সে আবার শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

একটা-দুটো-তিনটে। রাত শেষ হয়ে আসছে। আজ কেন জানি না একটু ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। আমি রাতের পর রাত জেগে সেবা করেছি, কখনও ক্লান্তি আসেনি। আজ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। দেহের ক্লান্তি কি মনের ক্লান্তি বুঝতে পারছি না। কিন্তু যাকে সারাজীবন এই কাজ করতে হবে, তার ক্লান্তি এলে চলবে কেন? ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

সাড়ে তিনটের সময় দোরের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি শঙ্খনাথবাবু দুপেয়ালা চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন; মুখে একটু হাসি। উঠে গিয়ে তাঁর হাত থেকে চা নিলুম। বললুম, আপনি রোজ রোজ এত রাত্রে আমার জন্যে চা তৈরি করে আনেন কেন? আমার দরকার হলে আমি নিজেই তো চা তৈরি করে নিতে পারি।

তিনি বললেন, শুধু কি তোমার জন্যে তৈরি করেছি। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুমুতে পারি না, তখন চা খেতে ইচ্ছে করে। নিজেই চা তৈরি করে খাই। তুমি জেগে থাক তাই তোমার জন্যেও করি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম, ধন্যবাদ। আপনি–

তিনি তর্জনী তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমি খানিক তাঁর হাসি-হাসি মুখের পানের চেয়ে বললুম, কী হল?

তিনি বললেন, আমাকে আপনি বলছ যে।তুমি বলবার কথা। কী চুক্তি হয়েছিল?

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। কিন্তু সত্যিই তো আর ভদ্রলোককে তুমি বলা যায় না, মুখ দিয়ে বেরুবে কেন? রাগের মুখে কী বলেছিলুম, উনি সেটি মনে গেঁথে রেখেছেন।

ওকথা এড়িয়ে বললুম, শঙ্খনাথবাবু, একটা কথা বলি?

তিনি সন্দিগ্ধভাবে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, কী কথা?

একটু ইতস্তত করে বললুম, এবার আমাকে ছুটি দিন। পিউ তো এখন সেরে গেছে—

কথা ছিল যতদিন না ভাল ঝি পাই কতদিন তুমি থাকবে।

তা সত্যি কিন্তু কতদিনে আপনি ভাল ঝি পাবেন তার ঠিক কী? আমি অন্য কাজও তো আছে আমার।

যদি আরও বেশী টাকা চাও—

না না, টাকার কথা নয়। টাকা আপনি যথেষ্ট দিচ্ছেন, কিন্তু–

বুঝেছি, সলিলার ব্যবহারে তুমি রাগ করেছ। কিন্তু পিউ তো কোনও দোষ করেনি।

আমার চোখে জল এসে পড়ল। কোনওমতে সামলে নিয়ে বললুম, কেউ কোনও দোষ করেনি। কিন্তু আমাকে আর এখানে দরকার নেই, কাল থেকে আর আমি আসব না।

এবার তাঁর সুর কড়া হয়ে উঠল–বেশ, আসতে না চাও এসো না। আমি কারুর ওপর জোর করতে চাই না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি বলেই থাকতে বলেছিলাম। এই বলে হঠাৎ চলে গেলেন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। শঙ্খনাথবাবু এতটা অবুঝ হবেন ভাবিনি। তাঁকে অসন্তুষ্ট করে চলে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না, ভালয় ভালয় যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু উপায় কী? বাঁধন তো ছিঁড়তে হবে।

সকালে পিউ জেগে ওঠবার আগেই চলে এলুম। ইচ্ছে হল পিউয়ের ঘুমন্ত গালে একটা চুমু খাই। কিন্তু কাজ নেই মায়া বাড়িয়ে।

শঙ্খনাথবাবু গম্ভীরমুখে টাকা চুকিয়ে দিলেন, কথা কইলেন না। মোটর বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

পিউয়ের কথা মনে পড়ছে আর বুকের মধ্যে টনটন করে উঠছে। আর হয়তো কোনওদিন ওকে দেখতে পাব না। কিন্তু এই ভাল।

বাসায় পৌঁছে দেখলুম শুক্লা কাজে বেরুচ্ছে। বলে গেল, এ-বেলা রান্না হল না, হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খাস। আমার ফিরতে সন্ধ্যে হবে।

কিন্তু হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খেতে ইচ্ছে হল না। বাড়িতে ডিম ছিল, তাই দুটো সেদ্ধ করে খেলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম।

ঘুম ভাঙল পৌনে দুটোর সময়। উঠে রান্না চড়াম। বেশী কিছু নয়, ভাত ডাল আর একটা নিরামিষ তরকারি। শুক্লা ফিরলে দুজনে মিলে খাব। যদি দরকার হয় হোটেল থেকে মাংস আনিয়ে নিলেই হবে।

রান্না শেষ করে ডায়েরি লিখতে বসেছি। আজ রাত্রে জামাইবাবু আসবেন কি না কে জানে। মনটা ওই ব্যাপার নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। যদি আসেন রাত্রি দশটার আগে আসবেন না। তখন ওঁর জন্যে ভাল করে রান্না করব। আজ রাত্তিরে আমার তো কোথাও যাবার নেই।

# ২১ শ্রাবণ।

শুক্লা ফিরল সন্ধ্যে পেরিয়ে। একটা বড় নার্সিংহোমে নার্সের ঘাটতি হয়েছে, শুক্কা সেখানে যাচ্ছে। দিনের বেলা কাজ।

শুক্লা ইউনিফর্ম ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এল, দুজনে খেতে বসলুম। খাওয়া শেষ হলে দুজনে বিছানায় গিয়ে শুলুম, মুখোমুখি শুয়ে গল্প করতে লাগলুম। সেই আগের কালের মত, যখন হস্টেলে থাকতুম। এখনও সুবিধে পেলেই আমরা ওইভাবে গল্প করি।

শুক্লাকে সলিলার কথা বললুম, শুনে সে হাসতে লাগল। আমি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে তাকে গন্ধ শোঁকালুম, সে চোখ বুজে চুপটি করে পড়ে রইল; তারপর গুনগুনিয়ে গাইল—গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মুর্ছে আনন্দে–

আমি বললুম, এমন গন্ধ শুকতে শুকতে মরেও সুখ, কী বলিস? শুক্লা বলল, হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের কাপলে নেই। মরণকালে আমাদের এ গন্ধ কে শোঁকাবে বল?

মরণকালের এখনও বোধহয় দেরি আছে। থুথুড়ি বুড়ি হয়ে যাব, তবে মরব। তখন বুড়ি নার্সকে আড়াই শো টাকা দামের গন্ধ কে শোঁকাবে!...

এক সময় জিগ্যেস করলুম, হাঁরে, সেই টেলিফোন আর এসেছিল?

না, আর আসেনি। কিন্তু যদি মন্মথ কর হয়, আর জেনেশুনে বজ্জাতি করবার জন্যে ফোন করে থাকে—

তাহলে?

তাহলে সহজে ছাড়বে না। নাছোড়বান্দা লোক। দেখছিস না, তোর আশা এখনও ছাড়েনি।

জামাইবাবুকে তোর সন্দেহের কথা বলেছিলি?

তারপর থেকে দেখাই পাইনি, বলব কাকে? টেলিফোনও করেননি।

আজ হয়তো আসবেন।

রাত্রে আমরা যে-সময়ে খাই সে-সময় খেলুম না। শুক্লা ছটফট করে বেড়াচ্ছে, হয়তো জামাইবাবু আসবেন। রান্না তিনজনের মতই করে রাখা হয়েছে।

প্রায় পৌনে দশটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরলুম। নিশ্চয় জামাইবাবু।

মোটা গলায় আওয়াজ এল,-হ্যালো—প্রিয়দম্বা?

এক মুহূর্তের জন্যে থতিয়ে গেলুম, তারপর বললুম, শঙ্খনাথবাবু! এত রাত্রে কী খবর?

তিনি বললেন, খবর আর কী, পিউ কিছুতেই ঘুমুচ্ছে না, কেবল দম্মা দম্মা বলে কাঁদছে।

দম্মা দম্মা বলে কাঁদছে! তার মানে?

বুঝতে পারলে না?তোমাকে ডাকছে। তোমার পুরো নামটা বলতে পারে না, তাই দম্মা বলে।

ভারি রাগ হল, বললুম, এ আপনার কাজ, আপনি ওকে শিখিয়েছেন দম্মা বলতে।

আরে না না, আমি শেখাব কেন? ও যা শোনে তাই শেখে। আমাকে প্রিয়দম্বা বলতে শুনেছে, তাই–

যাকগে। ওকে খানিকটা ওভালটিন খাইয়ে দিন। তাহলেই ঘুমিয়ে পড়বে।

খাওয়াবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু খাচ্ছে না। কেবল কাঁদছে। তুমি না এলে ও ঘুমুবে না।

কী উত্তর দেব, চুপ করে রইলুম। শঙ্খনাথবাবু বললেন, তুমি একটিবার আসবে? গাড়ি পাঠাব?

গলার স্বর যতদূর সম্ভব নীরস করে বললুম, পাঠান। কিন্তু পিউ ঘুমুলেই আমি চলে আসব।

আচ্ছা আচ্ছা।

টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে গেলুম নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে শুক্লা এসে ঢুকল–কী রে, এখন বেরুবি নাকি?

তাকে বললুম পিউয়ের কথা। শুনে সে বলল, আহা, বেচারী মায়ের আদর তো কখনও পায়নি, তাই তোকেই আঁকড়ে ধরেছে। আজ কি সারারাত থাকবি?

বললুম, না, ওকে ঘুম পাড়িয়ে ফিরে আসব।

পনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়ি এল।

গিয়ে দেখলুম পিউ ঘুমিয়ে পড়েছে। শঙ্খনাথবাবু ঘরে আছেন, কলাবতী পিউয়ের খাটের পাশে মেঝেয় বসে আছে।

শঙ্খনাথবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, এইমাত্র কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল।

পিউয়ের পাশে গিয়ে বসলুম। চোখের কোলে জল শুকিয়ে আছে, ঠোঁট দুটি ঘুমের মধ্যেও ফুলে ফুলে উঠছে। ইচ্ছে হল দু হাতে ওকে বুকে চেপে ধরে ঘুম ভাঙিয়ে দিই। কিন্তু না, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে হয়তো আর ঘুমুবে না। যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন ঘুমুক।

আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত রাখলুম। একটি ছোট্ট নিশ্বাস পড়ল; যেন আরও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল। ঘুমের মধ্যে কি বুঝতে পেরেছে যে আমি এসেছি?

আধ ঘণ্টা তার গায়ে হাত দিয়ে বসে রইলুম। কলাবতী উঠে গিয়ে দোরের পাশে বসল। শঙ্খনাথবাবু ঘরের এমুড়ো-ওমুড়ো পায়চারি করতে লাগলেন। সলিলা বোধহয় আজ নাচতে বেরিয়েছে, তাকে দেখলুম না।

সাড়ে দশটার পর উঠলুম। শঙ্খনাথবাবু পায়চারি থামিয়ে তীব্র চোখে আমার পানে তাকালেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললুম, আমি এবার যাই।

যাচ্ছ?

হ্যাঁ। আমার থাকার দরকার নেই।

তিনি আরও কিছুক্ষণ তীব্র চোখে চেয়ে রইলেন, তারপর পকেট থেকে টাকা বার করে আমার সামনে ধরলেন।

রাগে গা জ্বলে গেল। আমি যেন টাকার জন্যে এসেছি। বড়মানুষ কিনা, টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। খুব ধীরভাবে বললুম, টাকার দরকার নেই।

নেবে না?

না।

শঙ্খনাথবাবু নোটগুলো মুঠিতে পাকিয়ে পকেটে পুরলেন। মনে হল তিনি ভীষণ অপমানিত হয়েছেন এবং দাঁত কিড়মিড় করছেন। আমি আর দাঁড়ালুম না, ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেলুম। যা রাগী লোক, এখনই হয়তো চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন। এমন মানুষ দেখিনি; নিজের মনের মত সব হওয়া চাই, তা না হলেই চিৎকার লাফালাফি। আমার ইচ্ছে আমি টাকা নেব না। উনি মেজাজ দেখাবার কে?

বাসায় ফিরলুম প্রায় এগারোটা।

জামাইবাবু এসেছেন। এখনও খেতে বসেননি, আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বললেন, এস সখি! তোমার নাকি একটি মেয়ে জুটেছে?

তাঁর পাশে গিয়ে বসলুম। শুক্লা বলল, আর বসিনি প্রিয়া, কাপড় বদলে আয়। আমি ভাত বাড়তে চললুম।

আমার মনটাও কেমনধারা হয়ে গিয়েছিল, জামাইবাবুর সঙ্গে বসে একটু হাসি-গল্প করব তা আর ইচ্ছে হল না। নিজের ঘরে গিয়ে কাপড়চোপড় বদলে মুখে চোখে জল দিয়ে এসে খেতে বসলুম।

বসবার ঘরে টেবিলের ওপর চাদর পেতে আমাদের খাওয়া-দাওয়া। যা যা রান্না হয়েছে টেবিলের ওপর এনে রাখা হয়, তারপর যার যেমন দরকার নিজের হাতে তুলে নিয়ে খাই।

খেতে খেতে কথা হল। জামাইবাবু বেশীর ভাগ কথা বললেন। শুক্লা তাঁকে মন্মথ করের কথা বলেছে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। জামাইবাবু তাকে চেনেন; ভারি ভাল ছেলে, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। কয়েক বছরের মধ্যে প্র্যাকটিস বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সে মিছিমিছি পরের গুপ্তকথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে কেন?

একটা ভাল খবর এই যে, জামাইবাবুর সহধর্মিণীর কানে কথাটা এখনও ওঠেনি। তাই তিনি একটু আশ্বস্ত হয়েছেন। বললেন, তুমি বোধহয় ভুল করেছ শুক্লা। টেলিফোনে গলার আওয়াজ সব সময় ধরা যায় না। একজনের গলা আর-একজনের গলা বলে মনে হয়।

শুক্লা বলল, কিন্তু একজন কেউ জানতে পেরেছে।

জামাইবাবু বললেন, হয়তো পেরেছে। কিন্তু তার মনে কোনও কু-অভিপ্রায় নেই। থাকলে এতদিন শহরময় টি-টি পড়ে যেত, আমার বাড়ি ঢোকবার উপায় থাকত না।

শুক্লা চুপ করে রইল; কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, মন্মথ করের বিয়ে হয়েছে কি না জান?

জামাইবাবু আশ্চর্য হয়ে চোখ তুললেন,—বিয়ে। যতদূর জানি, সে বিয়ে করেনি। কেন বল দেখি?

শুক্লা তখন চায়ের নেমন্তন্নর কথা বলল। সব শুনে জামাইবাবু বেশ কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলেন। তারপর বললেন, তাই নাকি। ওর এসব গুণ আছে তা জানতাম না। কিন্তু মতলবটা

কী? চাপ দিয়ে প্রিয়ংবদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়?

আমি হাল্কা সুরে বললুম, কিন্তু তাতে ক্ষতিই বা কী? ওর সঙ্গে চা খেলে আমার তো আর জাত যাবে না।

জামাইবাবু গম্ভীর করে বললেন, না সখি, ও যদি এই ক্লাসের লোক হয় তাহলে তুমি কক্ষনো ওর চায়ের নেমন্তন্ন নেবে না। কোন কেসে ডাকলেও যাবে না। ও যা পারে করুক। ইতিমধ্যে খোঁজ নিচ্ছি ও কেমন লোক। যদি সত্যিই পাজি লোক হয়, তিনি কপাল কুঁচকে চুপ করলেন, কথাটা শেষ করলেন না।

খাওয়া শেষ হলে জামাইবাবুকে পান এনে দিলুম। তিনি হেসে বললেন, কই, তোমার মেয়ের কথা বললে না?

বললুম, শুক্লার কাছে শুনবেন। আমার ঘুম পাচ্ছে, শুতে চললুম।

ওরা বসে রইল, আমি শোবার ঘরে এসে দোর বন্ধ করলুম। যেদিনই জামাইবাবু আসেন, আমি খাওয়ার পর একটা ছুতো করে নিজের ঘরে চলে আসি। ওদের তো একটু নিরিবিলি দরকার।

আজ কিন্তু সত্যিই আমার শরীরটা ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম পিউয়ের কথা। আজ সে আমার জন্যে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে; কাল হয়তো আর কাঁদবে না, এমনিই ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর ক্রমে আমাকে ভুলে যাবে। ছেলেমানুষ তো, ওদের স্মৃতিশক্তিই বা কতটুকু! পরে যদি কোনওদিন আমাকে দেখতে পায়, চিনতেই পারবে না।

মাত্র তিন দিন তো পিউ আমাকে দেখেছে, এরই মধ্যে এত ন্যাওটা হল কী করে? মায়ের আদর পায়নি তাই? কী জানি! আমারই বা ওর ওপর এত মন পড়ল কেন? সুন্দর মেয়ে, তাই? কী জানি...

# ২৭ শ্রাবণ।

কয়েকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি।

শুনেছি যারা ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করে, প্রথম প্রথম তারা খুব আগ্রহের সঙ্গে লেখে; তারপর ক্রমে তাদের মন এলিয়ে পড়ে। আমারও হয়তো তাই হয়েছে। কদিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ আছে, বেশ গুমোট চলেছে। বর্ষাঋতু প্রায় শেষ হয়ে এল। এ সময় শরীর ভাল থাকে না। তার ওপর আমার একটা নতুন কাজ জুটেছে; বেলা দুপুর থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত একটি রোগিণীর সেবা করতে হয়। যখন কাজ সেরে ফিরে আসি তখন আর ডায়েরি লেখার মত মনের অবস্থা থাকে না।

রোগিণীর বয়স হয়েছে, বড় মানুষের গিন্নী। রোগও এমন কিছু মারাত্মক নয়; কিন্তু মহিলাটি বাড়িসুদ্ধ লোককে তটস্থ করে রেখেছেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হুকুম চালাচ্ছেন; ছেলেরা ছুটোছুটি করছে, পুত্রবধুরা ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। কতা মাঝে মাঝে দরজায় উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ঘরে ঢোকবার হুকুম নেই। পাছে আমার ওপর তাঁর চোখ পড়ে।

এমনই বিরক্তিকর পরিবেশের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়। কিন্তু যাক গে, ভাল লাগে না। এসব ছোট কথা লিখতে।

কাল কাজ থেকে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। পোশাক ছেড়ে স্নান করলুম, তারপর হাল্কা একটা শাড়ি পরে শুক্লার সঙ্গে চা খেতে বসলুম। শুক্লার আজ কাজ নেই, সে বাড়িতেই ছিল; রান্নাবান্না সব করে রেখেছে।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে, আমরা বসে গল্প করছি, এমন সময় নীচে দরজার সামনে একটা মোটর এসে থামার শব্দ হল। শব্দটা যেন চেনা-চেনা। উঠে গিয়ে বারান্দা থেকে নীচে তাকালুম। বুকটা ধক করে উঠল। শঙ্খনাথবাবুর প্রকাণ্ড গাড়িখানা এসে দাঁড়িয়েছে এবং তিনি গাড়ি থেকে নামছেন।

ছুটে গিয়ে শুক্লাকে বললুম, শঙ্খনাথবাবু আসছেন। তারপর দরজা খুলে দিতে গেলুম।

ক্লান্তভাবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে শঙ্খনাথবাবু দরজার সামনে দাঁড়ালেন। আমার পানে নিষ্পলক চেয়ে রইলেন।

আমি অস্বস্তি দমন করে বললাম, আসুন। পিউ ভাল আছে? তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন কিনা সন্দেহ। হঠাৎ বললেন, বাঃ! তোমাকে এ-বেশে কখনও দেখিনি। যেন লক্ষ্মী ঠাকরুন।

জড়সড় হয়ে পড়লুম, কী বলব ভেবে পেলুম না। তিনি আমার আরও কাছে সরে এসে করুণস্বরে বললেন, প্রিয়দম্বা, আজ রাত্তিরে আমাকে দুটি খেতে দিতে পারবে? এই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। শঙ্খনাথবাবু খেতে এসেছেন আমার কাছে। তারপর সামলে নিয়ে বললুম, আসুন আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরে বসবেন চলুন।

তাঁকে ঘরে এনে বসালুম। দেখলুম ইতিমধ্যে শুক্লা চায়ের বাসন সরিয়ে ফেলেছে এবং নিজেও অন্তর্ধান করেছে।

শঙ্খনাথবাবু ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, খাসা বাসাটি। তা আমাকে খেতে দেবে তো?

আমি ব্যাকুল হয়ে বললুম, শঙ্খনাথবাবু, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি ঠাট্টা করছেন, না সত্যি সত্যি বলছেন।

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, কী মুশকিল। ঠাট্টা করব কেন! আমিই সত্যিই খেতে এসেছি।

কিন্তু কেন? কেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। বাড়িতে খাবেন না কেন?

তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল, বললেন, আমার বাড়িতে আজ মোচ্ছ। তাই আগেভাগেই চলে এলাম।

মোচ্ছব! সে আবার কী?

মোচ্ছ বুঝলে না? নাচগানের মোচ্ছ। ছাতের ওপর আসর বসবে, রেডিওতে নাচের বাজনা বাজবে, সারি সারি টেবিল সাজিয়ে বুফে ডিনার তৈরি থাকবে। বোষ্টম-বোষ্টমীরা নাচবে আর খাবে।

ও! আজ বুঝি আপনার বাড়িতে পার্টি?

হুঁ। গোটা পঞ্চাশ ন্যাড়া-নেড়ীর নেমন্তন্ন হয়েছে। নটা থেকে পার্টি আরম্ভ হবে...তার আগেই আমি কেটে পড়েছি।

ওঁর কথা শুনলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। হাসি চেপে বললুম, আপনি না হয় পালিয়ে এলেন, কিন্তু পিউ কোথায় রইল?

কলাবতীর কাছে। সে আর কোথায় যাবে, তার তো পালাবার উপায় নেই।

একবার ইচ্ছে হল জিগ্যেস করি, তাকে নিয়ে এলেন না কেন? কিন্তু তা না বলে প্রশ্ন করলুম, পিউ আমার জন্যে কান্নাকাটি করে না?

তিনি বললেন, কান্নাকাটি আর করে না, তবে মাঝে মাঝে দম্মা দম্মা বলে ডাকে। সে যাক, এখন খেতে দেবে কি না বল। যদি না দাও হোটেলে চেষ্টা দেখি।

বললুম, হোটেলে চেষ্টা দেখতে হবে না, এখানেই খাবেন কিন্তু শাক ভাত। তার বেশী বোধহয় কিছু দিতে পারব না।

খুশি হয়ে বললেন, শাক ভাতই যথেষ্ট।

তাহলে আপনি বসুন, আমি এখনই আসছি–বলে আমি রান্নাঘরে গেলুম।

শুক্লা রান্নাঘরে ছিল, আমার পানে চোখ বড় করে তাকাল। আমি ফিসফিস করে তাকে সব বললুম। শুনে সে মাথায় হাত দিয়ে বসল।

বড়মানুষ অতিথি, কী খেতে দেব রে?

কী কী আছে?

আজ কি কিছু বেঁধেছি। পুঁইশাক আর কুচো চিংড়ি দিয়ে বাটি-চচ্চড়ি, কাঁকড়ার ঝাল আর ভাত।

তা আর উপায় কী, ওই দিয়েই চালাতে হবে। ভাতে বোধহয় কুলবে না

আমি দুমুঠো চাল চাপিয়ে দিচ্ছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে। তুই যা।

না, তুই আয় আমার সঙ্গে, শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তুই ওঁর কাছে বসে গল্প। করিস, আমি রাঁধব। তুই একা সারাক্ষণ বেঁধে মরবি কেন?

বেশ, তোর যখন তাই ইচ্ছে—

দুজনে বসবার ঘরে গিয়ে দেখি শঙ্খনাথবাবু চোখ বুজে হাত জোড় করে বসে আছেন; তাঁর ঠোট দুটি নড়ছে, যেন বিড়বিড় করে কিছু বলছেন। আমাদের পায়ের শব্দে তিনি চোখ খুললেন। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ও কী হচ্ছে।

তিনি বললেন, মা কালীর কাছে মানত করছিলাম—হে মা, আজ রাত্তির বারোটার আগে যেন বিষ্টি হয়, ওদের মোচ্ছ যেন ভেসে যায়।

আমরা দুজনেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলুম, কী মানুষ আপনি! পরের অনিষ্ট-চিন্তা করছেন?

তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন, অনিষ্ট-চিন্তা করব না। যারা আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছে তাদের অনিষ্টা-চিন্তা করব না?

আমার হাসি থেমে গেল। বললুম, ও কথা যাক। এই আমার বন্ধু শুক্লা। আমার দুজনে একসঙ্গে থাকি, একই কাজ করি।

তিনি বললেন, বেশ বেশ, বয়সও প্রায় একই। তা আজ আমি তোমাদের দুজনেরই অতিথি।

বললুম, হাঁ। একটু দেরি হবে কিন্তু। ততক্ষণ আপনি শুক্লার সঙ্গে গল্প করুন। ইতিমধ্যে যদি চা খেতে চান–

দরকার নেই।

আমি রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে রান্না চড়ালুম। ভাঁড়ারে চাট্টিখানি ভাল চাল ছিল, বাঁকতুলসী চাল, তাই চার মুঠি চড়িয়ে দিলুম। শঙ্খনাথবাবুর খোরাক কী রকম তা তো জানি না, তবে চেহারা দেখে খোশ-খোরাকি মনে হয় না। একটু বেশী করে ভাত রাঁধাই ভাল, শেষে লজ্জায় পড়ে যাব।

আমাদের দুটো প্রেশার-স্টোভ আছে; একটাতে ভাত চড়িয়ে দিলুম, অন্যটাতে আলু-বেগুনবাড়ি দিয়ে ঝোল চড়ালুম। তবু তিনটে ব্যঞ্জন হবে। তার কম কি ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়?

সাড়ে নটার সময় শঙ্খনাথবাবুকে খেতে দিলুম।

ইতিমধ্যে শুক্লার সঙ্গে তাঁর ভাব হয়ে গেছে। শুক্লাকেও তিনি গোড়া থেকে তুমি বলেই সম্বোধন করছিলেন এবং জোর গলায় তাকে লেকচার দিচ্ছিলেন। লেকচারের মর্ম—তোমাদের মত মেয়েরা বিয়ে করে না বলেই তো দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে। শুক্লা গালে হাত দিয়ে বসে শুনছিল। কী বলবে সে? বলবার তো কিছু নেই।

আমি টেবিলের ওপর সাদা চাদর পেতে অব্যঞ্জন তার ওপর রাখতেই তিনি চেয়ার টেনে খেতে বসে গেলেন। আমাদের একবার জিগ্যেস করলেন না, আমরা তাঁর সঙ্গে খাব কি না! কথাটা বোধহয় তাঁর মনেই আসেনি। শুক্লা আড়চোখে আমার পানে চেয়ে একটু হাসল।

খুব তৃপ্তি করে খেলেন শঙ্খনাথবাবু। প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন চেখে চেখে, প্রত্যেকটি গ্রাসের স্বাদ নিয়ে। বাটি-চচ্চড়ি দুবার চেয়ে খেলেন। তারপর খাওয়া শেষ করে মাঝারি গোছের একটি ঢেকুর

তুলে মুখ ধুয়ে এসে বসলেন। পরম তৃপ্তিতে নিশ্বাস ফেলে বললেন, আঃ!

শুক্লা বিনয় করে বলল, কিছুই তো খেলেন না।

তিনি পেটে হাত বুলিয়ে বললেন, পেটে জায়গা থাকলে আরও খেতাম। কে বেঁধেছে? এমন রান্না তিন বছর খাইনি।

শুক্লা বলল, আমরা দুজনেই বেঁধেছি। তিনি বললেন, তোমরা আমার লোভ বাড়িয়ে দিলে। আবার একদিন এসে যদি খেতে চাই, খেতে দেবে তো?

শুক্লা বলল, নিশ্চয় দেব। কিন্তু দয়া করে অন্তত দুঘন্টা আগে খবর দেবেন।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, সেটি হবে না। যখন আসব হঠাৎ আসব। তোমরা নিজেদের জন্যে যা বেঁধেছ তাই খাব।

বললুম, তাহলে বাটি-চচ্চড়ি আর কাঁকড়ার ঝাল ছাড়া আর-কিছু জুটবে না।

যা জুটবে তাই খাব। প্রিয়দম্বা, তোমরা এখনও বাটি-চচ্চড়ি আর কাঁকড়ার ঝালের মর্ম বোঝনি। যদি তিন বছর বাবুর্চির হাতের কালিয়া কাবাব খেতে তাহলে বুঝতে।কজির ঘড়ির দিকে। তাকিয়ে বললেন, হুঁ, এগারোটা বাজে। তোমাদের খেতে দেরি হয়ে গেল। আজ উঠি।

তিনি বারান্দায় এলেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে এলুম। আকাশে অল্প মেঘ আছে, তার ফাঁকে ফাঁকে তারা মিটমিট করছে। আমি বললুম, আপনার প্রার্থনা মাকালী শুনতে পাননি মনে হচ্ছে।

তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বিমর্ষভাবে ই বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম গাড়ি চলে গেল। তখন আমরা এসে খেতে বসলুম।

শুক্লা বলল, যা-ই বলিস লোকটি ভাল। সত্যি ভাল।

আমি কি বলেছি মন্দ!

শুধু বাইরের পালিশ থাকলেই হয় না। মন্মথ করের তো খুব পালিশ আছে, তাই বলে সে কি ভাল লোক?

কে বলেছে মন্মথ কর ভাল লোক? তবে ভদ্রসমাজে বাস করতে হলে একটু পালিশ দরকার বইকি।

খাওয়া শেষ করে আমরা রাত বারোটা পর্যন্ত গল্প করলুম। তর্কে শুক্লা প্রমাণ করে দিলে শঙ্খনাথবাবু খাঁটি সোনা, তাঁর পালিশের দরকার নেই; আর মন্মথ করের যতই পালিশ থাকুক সে একটা নেকড়ে বাঘ এবং অজগর সাপ; হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। গল্প করতে করতে এক বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালবেলা উঠে দেখি আকাশ বেশ পরিষ্কার; রাত্তিরে বৃষ্টি হয়নি। শঙ্খনাথবাবুর মনস্কামনা সিদ্ধ হল না। আমার মনটাও একটু খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টি হলে বেশ মজা হত।

বেলা আন্দাজ দশটার সময় শঙ্খনাথবাবুর মোটর এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল, মোটর থেকে নামল শিউসেবক। তার হাতে একটা বাদামী কাগজ-মোড়া চৌকো গোছের বাক্স। আমি সিঁড়ির দরজা খুলে দিলে সে সেলাম করে বাক্সটা আমার হাতে দিল, সসম্ভ্রম হেসে বলল, বাবুজি পাঠিয়েছেন।

আমি আর শুক্লা বাক্সটি টেবিলের ওপর রেখে কাগজের মোড়ক খুললুম। দেখি একটি ঝঝকে সুন্দর ইলেকট্রিক স্টোভ।

শুক্লা হাততালি দিয়ে কলকণ্ঠে হেসে উঠল, দেখেছিস ভদ্রলোক কাকে বলে?

শিউসেবককে দুটাকা বকশিশ দিলুম।

# ৬ ভাদ্র।

কয়েকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি। কী করব, হয়ে উঠছে না। কাজকর্ম করে তবে তো ডায়েরি লেখা?

জীবনের চাকা আবার বাঁধা-ধরা পথে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। রুগীর সেবা করা, খাওয়া ঘুমোনো গল্প করা। হোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

জামাইবাবু রাত্রির অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত আসা-যাওয়া করেন; কোনওদিন জানতে পারি, কোনওদিন পারি না। শুক্লার মুখে শুনেছি, মন্মথ কর সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ভয়ানক ধূর্ত লোক। একদিন আমাকে ফোন করেছিল, কেমন আছেন? চায়ের নেমন্তন্ন মনে আছে তো?

বলেছিলাম, মনে আছে। কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত সময় নেই।

সে বলেছিল, ব্যস্ত? আমার একটা কেসে নার্স দরকার, ভেবেছিলাম আপনাকেই ডাকব।

ধন্যবাদ। কিন্তু এখন তো পারব না।

আচ্ছা, আপনি যাঁর সঙ্গে থাকেন, কী নাম মনে পড়ছে না, তিনিও কি এনগেজড?

হ্যাঁ, শুক্লা অন্য জায়গায় কাজ করছে।

ও! তা আমি অন্য ব্যবস্থা করব। আচ্ছা, আপনি ডক্টর নিরঞ্জন দাসকে চেনেন কি?

একটু চমকে গেলুম, ডক্টর দাসকে চিনি বইকি। তাঁর কাছে পড়েছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ। ভারি চমৎকার লোক—না?

তাই তো মনে হয়। কেন বলুন দেখি?

তিনি অমন ভাল লোক, কিন্তু তাঁর স্ত্রী শুনেছি ভীষণ দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েমানুষ। আপনি নিশ্চয় জানেন?

ডাক্তারদের ঘরের খবর আমি কোত্থেকে জানব?

তা বটে। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। চায়ের কথাটা মনে রাখবেন।

আর সন্দেহ নেই, মন্মথ করই শুক্লা আর ডক্টর দাসের কথা জানতে পেরেছে। কী চালাকির সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিল। ডক্টর দাসের স্ত্রী দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েমানুষ; অর্থাৎ

তাঁর কানে খবরটা তুলে দিলে কী ব্যাপার হবে তোমরা ভেবে দেখ। উঃ সাংঘাতিক লোক এই মন্মথ কর।

কিন্তু কেন? শুক্লা আমার বন্ধু, তাকে কলঙ্কের হাতে থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি মন্মথ করের সঙ্গে চা খেতে যাব, এই জন্যে? কিংবা ও হয়তো ভেবেছে আমাদের দুজনের সঙ্গেই ডক্টর দাসের ঘনিষ্ঠতা। কী নোংরা নিঘিন্নে মন লোটার। কিন্তু আমার ওপরেই বা এত নজর কেন? লম্পটের চোখে আমি কি এতই লোভনীয়?

কী আছে স্ত্রীলোকের শরীরে যার জন্যে পৃথিবী জুড়ে এমন টানাটানি হেঁড়াছিড়ি? খানিকটা রক্ত-মাংস বই তো নয়। এরই জন্যে এত? কিংবা ওরা হয়তো ভাবে শরীরটা পেলে সেই সঙ্গে আরও কিছু পাবে। যা খুঁজছে তা পায় না, তাই বোধহয় ওদের দেহের ক্ষুধা মেটে না; একটা দেহ। ছেড়ে আর একটা দেহের পানে ছুটে যায়। তারপর যখন নেশা কেটে যায় তখন দেখে সব ভাঁড়ই শুকনো, কোনও ভাঁড়েই রস নেই।

যাকগে। এসব অরুচির কথা ভেবে লাভ নেই। আমার জীবনে ও জিনিসকে আমি কাছে ঘেঁষতে দিইনি, কখনও দেবও না। আমি বেশ আছি, শান্তিতে আছি। শুক্লা সেদিন আপন মনে। গাইছিল-সই, কে বলে পীরিতি ভাল, হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কাঁদিয়া জনম। গেলদরকার নেই আমার পিরীতি করিয়া। পিরীতি করার কত সুখ তা তো চোখেই দেখেছি। শুক্লার মনে একদণ্ড শান্তি নেই, স্বস্তি নেই; যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছে।

পিউকে অনেকদিন দেখিনি। শঙ্খনাথবাবু বলে গিয়েছিলেন আবার একদিন খেতে আসবেন, কিন্তু আসেননি। কাজের লোক, হয়তো ভুলে গিয়েছেন। সেদিন শুক্লা বলল, ভদ্রলোক আর তো এলেন না। এমন সুন্দর জিনিস উপহার দিয়েছেন, আমাদের উচিত ওঁকে ধন্যবাদ দেওয়া। একবার ফোন কর না।

ফোন করলুম, কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। বাড়িতে বোধহয় কেউ নেই। শিউসেবকও যদি ফোন ধরত তাকে পিউয়ের কথা জিগ্যেস করতুম। এতদিনে নিশ্চয় বাড়িময় ছুটোছুটি আর খেলা করে বেড়াচ্ছে।

ভাদ্র মাস পড়ে অবধি বৃষ্টি বন্ধ ছিল, আকাশে মেঘও ছিল না। ভেবেছিলুম বর্ষা বুঝি শেষ হল। কিন্তু আজ সকাল থেকে আবার টিপটিপ আরম্ভ হয়েছে।

আমার জীবনে একটা বিচিত্র ব্যাপার বার বার ঘটতে দেখেছি। এক তো জন্মদিনে বৃষ্টি হবেই। তাছাড়া হঠাৎ যদি অসময়ে বৃষ্টি নামে সেদিন আমার জীবনে একটা কিছু ঘটবে, তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। বাবা যেদিন মারা যান, সেদিন বৃষ্টি পড়েছিল। তাই ভাবছি, আজ কিছু ঘটবে নাকি? কী ঘটতে পারে? কী ঘটা সম্ভব?

# ৭ ভাদ্র।

কাল ডায়েরি লেখা শেষ করলুম বিকেল পাঁচটা সময়। সওয়া পাঁচটার সময় টেলিফোন এল।

শঙ্খনাথবাবু ফোন করছেন; গলার আওয়াজ একটু যেন অন্য রকম। বললেন, প্রিয়দম্বা, তুমি একবার আসবে?

উকণ্ঠিত হয়ে বললুম, কী হয়েছে। পিউ কেমন আছে?

তিনি বললেন, পিউ ভালই আছে। আমার নিজের একটু শরীর খারাপ হয়েছে।

শরীর খারাপ। কী রকম শরীর খারাপ?

সামান্য জ্বর হয়েছে। আর গায়ে ব্যথা। একটু দুর্বল বোধ করছি।

বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ডাক্তার কী বললেন?

ডাক্তার ডাকিনি? সামান্য জ্বরে ডাক্তার কী করবে? তুমি একবার আসবে? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আচ্ছা। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

শুক্লা বাড়ি নেই। তাকে একছত্র চিঠি লিখে তৈরি হয়ে নিলুম। ব্যাগে সব জিনিস আছে কি না দেখে নিলুম। হয়তো রাত্তিরে থাকতে হবে। শঙ্খনাথবাবু বললেন বটে সামান্য জ্বর, কিন্তু বলা যায় না। এক ধরনের মানুষ আছে যারা নিজের অসুখকে অসুখ বলেই মনে করে না।

পৌনে ছটার সময় গাড়ি এল। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম। আকাশ অন্ধকার, কিন্তু রাস্তায় এখনও আলো জ্বলেনি।

শঙ্খনাথবাবুর বাড়িতে আলো জ্বলেনি। শিউসেবক গাড়ি বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, সেলাম করে বলল, আসুন মাজী। বাবু নীচেই আছেন। শিউসেবক আজ আমাকে প্রথম মাজী বলল।

বাড়িতে ঢুকেই সামনে লবি; লবির বাঁ পাশে ড্রয়িংরুম, ডান পাশ দিয়ে ওপরের সিঁড়ি উঠে গেছে। আর লবির মুখোমুখি একটা ঘর। ঘরটা অন্ধকার ছিল। শিউসেবক আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দিল। মাঝারি গোছের ঘর; একটা টেবিল, টেবিলের ওপর টেলিফোন; গোটা দুই চেয়ার, আর একটা খাট। খাটের ওপর শঙ্খনাথবাবু দোরের দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন।

শঙ্খনাথবাবুর চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর মুখে দুতিন দিনের দাড়ি। একটু হেসে হাত বাড়ালেন,—এস প্রিয়দম্বা।

বললুম, এ কী, আপনি এখানে শুয়ে আছেন যে।

তাঁর মুখ একটু ম্লান হল। বললেন, এটা অফিস-ঘর। বাড়িতে যখন কাজকর্ম করি, এখানেই বসি।

বললুম, তা বেশ তো, কিন্তু অসুস্থ শরীরে এখানে শোবার কী দরকার?

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, তাই নীচে থাকবার ব্যবস্থা করেছি। শেষে ছোঁয়াচ লেগে বাড়িসুদ্ধ পড়বে।

টেবিলের উপর ব্যাগ রেখে চেয়ার টেনে তাঁর খাটের পাশে বসলুম। বললুম, দেখি আপনার নাড়ী।

তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তারপর–তারপর—

কিন্তু নিজের কথা পরে বলব; আগে ওঁর কথাটা শেষ করে নিই।

নাড়ী দুর্বল এবং চঞ্চল। গা বেশ গরম। টেম্পারেচার নিলুম; একশ এক পয়েন্ট চার।

কবে থেকে জ্বর হয়েছে?

পরশু রাত্তির থেকে।

ওষুধ-বিষুধ কিছু খেয়েছেন?

কয়েকটা অ্যাস্পিরিনের বড়ি খেয়েছি।

আর পথ্য?

সাবুর জল।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলুম, তারপর মুখ তুলে বললুম, আপনার ফোন ব্যবহার করতে পারি?

কাকে ফোন করবে?

ডাক্তারকে।

ডাক্তার ডাকার দরকার?

দরকার।

বেশ, ডাক। ডক্টর করের ফোন নম্বর—

ডক্টর করকে ডাকব না। আমার একজন জানা ডাক্তার আছেন, তাঁকে ডাকব।

যা ভাল বোঝ কর।

জামাইবাবুকে ডাকলুম। তিনি ভাগ্যক্রমে নিজের ডিস্পেন্সারিতে ছিলেন, সব শুনে বললেন, ইনফ্লুয়েঞ্জাই তো মনে হচ্ছে।

বললুম, আপনি একবার আসবেন?

তিনি বললেন, আমি স্ত্রী-রোগের ডাক্তার, আমাকে কেন?

আপনি আসুন।

আচ্ছা যাব। কিন্তু একটু দেরি হবে, একটা কল সেরে যাব। সাতটা বাজবে।

তাই সই।

ফোন ছেড়ে দিলুম। কব্জির ঘড়িতে ছটা বেজেছে।

শিউসেবককে ডেকে বললুম, এক পট্ কড়া কফি তৈরি করে নিয়ে এস। আর গোটা কয়েক টোস্ট। টোস্টে মাখন লাগিও না।

জী, বলে শিউসেবক চলে যাচ্ছিল তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, পিউ কোথায়?

শিউসেবক বলল, পিউ-দিদি ওপরেই আছে। কলাবতী তাকে খেলা দিচ্ছে। এখানে আনতে বলব?

না না, এখানে আনতে হবে না। তুমি যাও, কফি আর টোস্ট তৈরি করে আন।

শিউসেবক চলে গেল। শঙ্খনাথবাবু কাতরভাবে বললেন, কিন্তু আমার যে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না প্রিয়দম্বা।

ইচ্ছে করুক আর না করুক, খেতে তো হবে।

তিনি মুখ বিকৃত করে শুয়ে রইলেন।

আমি অন্য কথা পাড়লুম, সেদিন আপনি যে চমৎকার স্টোভ উপহার দিয়েছিলেন তার জন্যে শুক্লা ধন্যবাদ জানিয়েছে।

তিনি বললেন, সেদিন তোমরা যা খাইয়েছিলে অমন তৃপ্তি করে অনেকদিন খাইনি।

বললুম, আবার যাবেন বলেছিলেন, গেলেন না তো।

তিনি বালিশের ওপর কনুই রেখে উঁচু হয়ে বললেন, যাব কোত্থেকে? ওই ব্যাটা লটুপ সিং বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে।

লিট্পট্ সিং কে?

তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল,–লটপটকে জান না? কর্নেল হড়বড় সিংয়ের ব্যাটা লেফটেনেন্ট লট্পট্ সিং। আমার বউয়ের প্রাণের বন্ধু।

শম্ভুনাথবাবুর অভ্যেস লোকের নাম উল্টোপাল্টা করা। বোধহয় লোকটার নাম লজপৎ সিং, উনি তাকে টুপ সিং করেছেন।

বললুম, যাতায়াত শুরু করেছে তো কী হয়েছে। বাড়িতে অতিথি আসবে না?

তিনি বললেন, অতিথি আসুক। ড্রয়িং রুমে বসে গল্প করুক, চা খাক, তারপর চলে যাক।–আমি সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরি না, সেদিন একটা দরকারে চারটের সময় ফিরে এসে দেখি, লটপট সিং আমার বউয়ের শোবার ঘরে আয়নার সামনে বসে সিগারেট খাচ্ছে। ভেবে দেখ দিকি।

আপনার স্ত্রী সেখানে ছিলেন?

সলিলা পাশের ঘরে সাজ-পোশাক পরছিল। মানে দুজনে মিলে বেরুবে।

তারপর?

তারপর লটপট সিংকে বললুম,—নিকালো হিঁয়াসে। ফের যদি আমার বাড়িতে মাথা গলিয়েছ ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব। বেটা নেড়ি কুত্তার মত পালাল।

আর আপনার স্ত্রী?

সলিলার বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছি।

তারপর?

তারপর আর কী? ঘরে বন্ধ করে রাখতে তো পারি না, তাই নিজেই বাড়ি আগলে পড়ে আছি। প্যান্‌প্যান্‌ নাকে-কাঁদুনি শুনছি। আমি সভ্যসমাজের চাল-চলন বুঝি না, তাই মিছিমিছি সন্দেহ করি। নিজের স্ত্রীকে যারা সন্দেহ করে তারা মানুষ নয়, যারা ঘরে আটকে রাখে তারা পশুর অধম–বুঝলে?

তিনি ক্লান্তভাবে আবার শুয়ে পড়লেন। আমি বললুম, আপনার শরীর দুর্বল হয়েছে, বেশী কথা কইবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। এ অবস্থায় বেশী উত্তেজনা ভাল নয়।

তিনি চোখ বুজে রইলেন।

বাইরে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। টিপটিপ বৃষ্টি চলেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—এইজন্যে অসময়ে বৃষ্টি নেমেছে। আমার মাথা খাবার জন্যে! কিন্তু—এ আমার কী হল? এ কী হল? কেন মরতে ওঁর নাড়ী দেখতে গিয়েছিলুম।

উনি বললেন, আর একবার নাড়ী দেখ তো প্রিয়ম্বা। যেন আরও দুর্বল মনে হচ্ছে।

ভয় পেয়ে ওঁর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলুম। না, ভয়ের কিছু নেই, তবে নাড়ী আরও দুর্বল হয়েছে। কী করি এখন! জামাইবাবুর আসতে দেরি আছে। শিউসেবক কফি নিয়ে এল না এখনও। আমার মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে ডাক ছেড়ে কাঁদি।

মনটাকে হিঁচড়ে টেনে খাড়া করলুম। না, এখন ওসব নয়; কাঁদবার অনেক সময় আছে।

আমি ওষুধ দিচ্ছি, বলে উঠে টেবিলের পাশে গেলুম। আমার ব্যাগে স্পিরিট অব অ্যামোনিয়া আছে, তাই ফোঁটা কয়েক খাইয়ে দিই—

শিশি বার করেছি এমন সময় এক কাণ্ড! সে কী কাণ্ড!

দেখি উনি হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসেছেন, জ্বলজ্বল চোখে দোরের বাইরে তাকিয়ে আছেন। তারপর এক হুঙ্কার ছাড়লেন, সলিলা! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

গলা বাড়িয়ে দেখলুম, সলিলা লবির কিনারায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার পরনে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি, হাতে একটা ছোট ব্যাগ। বোধহয় পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ভেবেছিল শঙ্খনাথবাবু দেখতে পাবেন না। আমি যদি তাঁর সামনে চেয়ারে বসে থাকতুম তাহলে বোধহয় দেখতে পেতেন না।

সলিলার শরীরের মোড় বাইরের দিকে, মুখখানা আমাদের দিকে। এইভাবে সে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফিরে এসে দেরের সামনে দাঁড়াল। তার মুখখানা ফ্যাকাসে, চোখের মিশমিশে কালো মণি দুটো আরও কালো দেখাচ্ছে।

শঙ্খনাথবাবু আবার বললেন, যাচ্ছ কোথায় তুমি?

সলিলার চোখ দুটো একবার আমার দিকে ফিরল। মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল। এত নরম সুকুমার মুখ এত কঠিন হয়ে উঠতে পারে ভাবা যায় না। কিন্তু সে নিচু গলাতেই বলল, আমার বাবা এসেছেন, গ্র্যান্ড হোটেলে আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

বাবা এসেছেন। মিথ্যে কথা। যাও, ওপরে যাও-বাড়ি থেকে তুমি বেরুতে পাবে না। এই বলে শঙ্খনাথবাবু সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখালেন।

সলিলার চোখের দৃষ্টি যেন বিষিয়ে উঠল, সে বলল, আমি যাব।

না, তুমি যাবে না। আমার হুকুম, তুমি বাড়ি থাকবে।

তোমার হুকুম আমি মানি না। আমি যাচ্ছি। কেউ আমাকে আটকাতে পারে না।

শঙ্খনাথবাবু ধড়মড় করে খাট থেকে নামবার উপক্রম করলেন। আমি এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলম, এখন ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললাম। তারপর যা বলেছি যা করেছি সব পাগলের কাণ্ড।

তিনি খাট থেকে নামতে নামতে চিৎকার করে উঠলেন, কী, এত বড় আস্পর্ধা–

আমি দুই হাত তাঁর বুকের ওপর রেখে তাঁকে আটকে রাখবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আটকে রাখা কি যায়। তিনি যেন উন্মত্ত, এখনই আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে

বেরিয়ে যাবেন। আমি তখন সমস্ত শরীর দিয়ে চেপে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম, হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, না, তুমি উঠতে পাবে না। দুর্বল শরীরে তোমার হার্ট ফেল করে যাবে। যার ইচ্ছে যাক, যেখানে ইচ্ছে যাক। তোমাকে আমি উঠতে দেব না।

লিখতে লিখতে ভাবছি, সত্যিই কি এই কথাগুলো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল? না আমার অন্তর্যামী আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন? আমি তো ভেবে-চিন্তে কিছু বলিনি, প্রচণ্ড ব্যগ্রতার তাগিদে কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

যাহোক, আস্তে আস্তে তিনি শান্ত হলেন; কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে রইল। আমি কে, তাও বোধহয় অনুভব করলেন না। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলুম সলিলা চলে গেছে। মোটরের আওয়াজ শুনিনি; বোধহয় হেঁটে বাড়ির ফটক পার হয়েছে, তারপর রাস্তায় ট্যাক্সি ধরেছে।

ইনি নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছেন, যেন গায়ের জোর সব ফুরিয়ে গেছে। ওষুধ খাইয়ে দিলুম, স্পিরিট অ্যামন অ্যারোম্যাট বিশ ফোঁটা। তারপরে কফি আর টোস্ট নিয়ে শিউসেবক এল। এদিকে যে এত ব্যাপার হয়ে গেছে, তার মুখ দেখে মনে হল সে কিছু জানে না।

শিউসেবক টেবিলের ওপর ট্রে রাখল। আমি খাটের ধারে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম, কফি ঢেলে দেব?

তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। এতক্ষণে যেন আমাকে দেখতে পেলেন, বালিশ থেকে মাথা তুলে বললেন, প্রিয়দম্বা, গ্র্যান্ড হোটেলে ফোন কর তো। ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নাও প্রাণগোপাল সেন হোটেলে উঠেছে কি না!

প্রাণগোপাল সেন কে?

পি. জি. সেন, আই. সি. এস–সলিলার বাপ।

আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেলুম। সলিলা যদি মিছে কথা বলে থাকে, তার বাপ যদি না এসে থাকেন, তাহলে ইনি জানতে পারলে আবার লাফালাফি শুরু করে দেবেন। কী করি! খানিক ইতস্তত করে বললাম, আগে কফি টোস্ট খেয়ে নিন, তারপর ফোন করব।

আপত্তি করলেন না। আমি বিছানার ওপর ট্রে রেখে কফি ঢেলে দিলুম, উনি বসে বসে খেতে লাগলেন। এক টুকরো শুকনো টোস্টও খেলেন। কতকটা সামলেছেন মনে হচ্ছে।

খাওয়া শেষ হয়েছে কি না-হয়েছে অমনি বললেন, এবার ফোন কর।

নাছোড়বান্দা মানুষ। কিন্তু ফোন করতে হল না, এই সময় জামাইবাবুর মোটর এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। জামাইবাবু যখন আমাদের বাসায় যান তখন মোটরে যান না, কিন্তু তাঁর একটি মোটর আছে। বেশী বড় গাড়ি নয়, কালো রঙের ছোট একটি গাড়ি। এই গাড়িতে চড়ে তিনি রুগী দেখতে যান।

আমি লবিতে বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলুম। তাঁর পরনে কোট প্যান্ট টাই, পকেট থেকে স্টেথস্কোপ উঁচু হয়ে আছে। মন্মথ করের মত অমন ফিটফাট নয়, কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ চেহারা মিলিয়ে একটি অনায়াস আভিজাত্য আছে। অনেকদিন তাঁকে এ বেশে দেখিনি।

শঙ্খনাথবাবু খাটে বসে ছিলেন, কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে নতুন ডাক্তারের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর তাঁর মুখের সংশয় পরিষ্কার হয়ে গেল। একটু অনুযোগের সুরে বললেন, দেখুন না ডাক্তারবাবু, আমার কিছুই হয়নি, মিছিমছি প্রিয়দম্বা আপনাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে আনল।

জামাইবাবু হাসলেন, কিছু হয়েছে কিনা আমি দেখলেই বুঝতে পারব। আপনি শুয়ে পড়ুন।

শঙ্খনাথবাবু শুলেন। ডাক্তার তাঁর নাড়ী দেখতে দেখতে সহজভাবে কথা বলতে লাগলেন, আপনার মেয়ে নাকি প্রিয়ংবদার খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছে।

শঙ্খনাথবাবু বললেন, মেয়ে ন্যাওটা হলে কী হবে, প্রিয়দম্বা তাকে একটুও ভালবাসে না।

এমন না হলে পুরুষমানুষের বুদ্ধি। আমি পিউকে ভালবাসি না! জামাইবাবুকে বললুম, আপনি পরীক্ষা করুন, আমি চট করে পিউকে দেখে আসি।

ডাক্তার রুগীকে বললেন, আপনি এবার গায়ের জামা খুলুন।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখলুম, পিউয়ের ঘরে কলাবতী মেঝের ওপর বসে আছে, আর পিউ তার কোলে শুয়ে কলা খাচ্ছে। বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব, বাড়ির গিন্নী যে কতার সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়েছে, তা কেউ জানে বলেও মনে হল না।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পিউ চোখ টেরিয়ে আমাকে দেখল, তারপর হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে দাঁড়াল।

আমি বললুম, পিউ!

দম্মা! বলে পিউ ছুটে এসে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরল। ভোলেনি আমাকে। চোখে জল এল, কোলে তুলে নিয়ে আদর করলুম, চুমু খেলুম; চুপিচুপি তার কানে কানে বললুম, পিউ, তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে?

পিউ বলল, উঁ?

বললুম, কিছু না। কলা খেয়েছ, এবার ঘুমিয়ে পড়।

সে আমার কাঁধে মাথা রাখল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম, কলাবতীকে বললুম, তুমি থাকবে তো?

সে বলল, জী, রাত্রে পিউরানীর কাছে শুই।

বেশ। আমি আবার দেখে যাব। বলে আমি নীচে নেমে গেলুম।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে, জামাইবাবু চেয়ারে বসে প্রেক্রিপশন লিখছেন, আমাকে দেখে মুখ তুললেন,—আশঙ্কার কিছু নেই, কিন্তু পাক্কা দুদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া বারণ! এই ওষুধটা আনিয়ে নাও-তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। আজ রাত্রে এক দাগ দিলেই চলবে, বাকী ওষুধ কাল খাবেন।

প্রেস্ক্রিপশন নিয়ে জিগ্যেস করলুম, কী খেতে দিতে হবে? কাল সাবুর জল খেয়েছিলেন, আজ আমি এসে কফি আর টোস্ট খাইয়েছি।

ডাক্তার বললেন, ঠিক করেছ। চা কফি কোকো টোস্ট দিতে পার। কাল জ্বর নেমে যাবে, তখন মুরগির সুপ, হাফ বয়েল্ড ডিম দেওয়া চলবে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, রুগীর দিকে হেসে তাকালেন, দুটো দিন একটু কষ্ট করুন, তারপর চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।–আচ্ছা চলি।

শঙ্খনাথবাবু বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনার ফী—

ডাক্তার বললেন, আপনি তো আমাকে ডাকেননি, আপনার কাছ থেকে ফী নেব কেন? প্রিয়ংবদা ডেকেছে, ওর কাছ থেকে নেব।

ডাক্তার ঘর থেকে বেরুলেন, আমি সঙ্গে গেলুম। জিগ্যেস করলুম, রাত্তিরে কি আমার থাকা দরকার?

বললেন, আমি তো কোনও দরকার দেখি না।

তখন আমি সলিলার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা বললুম। শুনে তিনি বললেন, তাই নাকি! তাহলে তো তোমাকে থাকতে হয়। মহিলাটি যদি দুপুর রাত্রে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয়ে যায়, তখন রোগীকে সামলাবে কে?

বেশ, আমি থাকব।

আচ্ছা। আমি শুক্লাকে খবর দেব যে আজ রাত্তিরে তুমি ফিরবে না।

একটু হেসে তিনি গাড়িতে উঠলেন, গাড়ি চলে গেল। শিউসেবক লবিতেই ছিল, তাকে প্রেস্ক্রিপশন দিয়ে বললুম, ওষুধটা ডিস্পেন্সারি থেকে আনিয়ে নাও। সে চলে গেল।

আমি ঘরে ফিরে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে রোগীর হুকুম হল, এবার গ্র্যান্ড হোটেলে ফোন কর।

আর এড়ানো যায় না। ডাইরেক্টরিতে নম্বর খুঁজে ফোন করলুম। ম্যানেজারকে পাওয়া গেল না, তার বদলে যে লোকটা ছিল সে স্পষ্টভাবে বলতে পারল না প্রাণগোপাল সেন নামে কেউ হোটেলে আছেন কি না। ভালই হল, শঙ্খনাথবাবুকে তাই বললুম। তিনি মুখ অন্ধকার করে শুয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, ডাক্তারবাবুটি বেশ লোক, চ্যাংড়া ডাক্তার নয়। নাম কী?

নিরঞ্জন দাস।

তোমার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে দেখলাম।

হ্যাঁ, আমি ওঁর ছাত্রী, ওঁর কাছে পড়েছি।

আর কিছু বললেন না, চোখ বুজে শুয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যাবার পর তিনি চোখ খুলে আমার দিকে ঘাড় ফেরালেন, রাত্তিরে থাকবে?

থাকব।

তুমি তো খেয়ে আসনি।

না।

তিনি তখন ডাকলেন, শিউসেবক।

শিউসেবক বোধহয় অন্য কোনও চাকরকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে নিজে লবিতে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ঘরে এসে বলল, জী?

ইনি আজ এখানে খাবেন। ওঁর খাবার এই ঘরে নিয়ে এস।

আমি বললুম, এই আটটা বেজেছে। এখন নয়, নটার পর। সেই সঙ্গে এঁর জন্যে দুধ দিয়ে কোকো তৈরি করে আনবে।

জী। শিউসেবক চলে গেল। সে পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে কিন্তু মালিকের সামনে হিন্দীতে কথা বলে। কলাবতী একেবারেই বাংলা বলতে পারে না, চেষ্টাও করে না।

সাড়ে আটটার সময় ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এল। এক দাগ খাইয়ে দিলুম।

তারপর আস্তে আস্তে সময় কাটতে লাগল। রুগী কখনও চুপচাপ শুয়ে আছেন, কখনও এপাশ ওপাশ করছেন। শরীরে যদি বা স্বস্তি থাকে, মনে স্বস্তি নেই। মনটা শরশয্যায় শুয়ে আছে।

সওয়া নটার সময় শিউসেবক খাবারের প্রকাণ্ড ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল, টেবিলের ওপর ট্রে রেখে বলল, মাজী, খাবার এনেছি।

ন্যাপকিন দিয়ে ট্রে ঢাকা, কী খাবার এনেছে দেখতে পেলুম না। জিগ্যেস করলুম, বাবুর মিল্ক-কোকো এনেছ?

জী, এনেছি।

উঠে গিয়ে ট্রে থেকে ন্যাপকিন তুললুম। বাদশাহী ব্যাপার। পোলাও চাপাটি মাছের ফ্রাই মাংসের কালিয়া চিংড়িমাছের মালাইকারি চাটনি রাবড়ি সন্দেশ। এক পাশে একটা বড় পেয়ালায় গরম মিল্ক-কোকো।

পেয়ালা নিয়ে খাটের কাছে গেলুম,—উঠে বসুন, খাবার এনেছি।

উঠে বসে পেয়ালা হাতে নিলেন, বললেন, তুমি খেতে বসো।

ঘরের লাগাও বাথরুম, সেখানে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের মুখখানা আয়নায় দেখলুম। প্রিয়ংবদা ভৌমিক, তোমার জীবন ওলট-পালট হয়ে গেছে, কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না।

ফিরে এসে খেতে বসলুম। উনি বসে বসে আমার খাওয়া দেখতে লাগলেন। এক সময় জিগ্যেস করলেন, কেমন বেঁধেছে?

বললুম, কাঁকড়ার ঝাল বাটি-চচ্চড়ির চেয়ে ভাল।

একটু হাসলেন, মুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। বেশ বোঝা যায় উনি মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসেন, মানুষকে তৃপ্তি করে খেতে দেখলে নিজে তৃপ্তি পান।

খুব তৃপ্তি করেই খেলুম। উনি বসে বসে দেখলেন। শিউসেবক পাশে দাঁড়িয়ে খাওয়া তদারক করল; তারপর খাওয়া শেষ হলে বাসন তুলে নিয়ে চলে গেল।

হাতমুখ ধুয়ে খাটের ধারে চেয়ারে এসে বসলুম, এবার আপনি শুয়ে পড়ুন। দশটা বেজে গেছে, ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

আমি ঘুমুব, তুমি একা জেগে থাকবে?

আমি চেয়ারে বসে বসে ঘুমুতে পারি। নিন আর কথা নয়, শুয়ে পড়ুন।

আর কথা হল না, উনি শুলেন। চোখের ওপর একটা বাহু রেখে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।–

এইবার নিজের কথা লিখি। কিন্তু কী ছাই লিখব? মরণের কি ধরন আছে। কেউ তিল তিল করে পুড়ে মরে, কেউ আতশবাজির মত এক লহমায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরই নাম ভালবাসা!

ভালবাসার কথা গল্প উপন্যাসে পড়েছি, শুক্লার মুখে কিছু কিছু শুনেছি। সে একবার বলেছিল–ভালবাসার কতখানি চোখের নেশা কতখানি মনের মিল, কতটা স্বার্থপরতা কতটা আত্মদান বুঝতে পারি না, হয়তো সবটাই জৈববৃত্তি। কিন্তু প্রেম যে হঠাৎ এসে এক মুহূর্তে জীবনকে তোলপাড় করে দিতে পারে একথা সে বলেনি। তবে কি সকলের প্রেম একরকম নয়?

প্রথম দর্শনেই প্রেম হয় শুনেছি। শকুন্তলার হয়েছিল, রোমিও-জুলিয়েটের হয়েছিল; আজকালও নিশ্চয় হয়। কিন্তু আমার হল না কেন? ওই যে মানুষটি একমুখ দাড়ি নিয়ে শুয়ে রয়েছেন ওঁকে তো আজ নতুন দেখছি না, বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি; তবে এতদিন কিছু মনে হয়নি কেন? বরং ওঁর কথাবার্তা আচার ব্যবহার খারাপই লেগেছিল। তারপর অবশ্য গা-সওয়া হয়েছিল, লোকটি যে অন্তরে খাঁটি তাও বুঝতে পেরেছিলুম। কিন্তু তাই বলে এরকম হবে এ যে কল্পনার অতীত! পুরুষের স্পর্শে কি ম্যাজিক আছে? এই জন্যেই কি আমাদের দেশে প্রবাদ আছে ঘি আর আগুন!

কিন্তু তাই বা কেন? আমার পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে; কচি খুকি নই, প্রথম-প্রণয়-ভীতা নবীনা কিশোরী নই। কাজের সুত্রে অনেক পুরুষের সঙ্গে হাত ঠেকাঠেকি হয়েছে;

জামাইবাবুর সঙ্গে কতবার খেলার ছলে পাঞ্জা লড়েছি, কখনও কিছু মনে হয়নি। তবে আজ আমার এ কী হল! এ কি কারুর হয়? এ কি সম্ভব?

নাড়ী দেখবার জন্যে ওঁর কব্জি আমার হাতে নিয়েছিলাম। মনে হল আমার চুল থেকে নখ পর্যন্ত একটা শিহরণ বয়ে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল; বুকের মধ্যে ঝড়ের বেগে মৃদঙ্গ বেজে উঠল। তারপর যন্ত্রের মত কী করেছি আবছা মনে আছে। হঠাৎ যখন সচেতন হলুম তখন দেখি, ওঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছি আর পাগলের মত বলছি—না, তুমি উঠতে পাবে না...তোমাকে উঠতে দেব না।

এ আমার কী সর্বনাশ হল! শুক্লা বলেছিল—পুরুষদের মধ্যে নেকড়ে বাঘ আছে, অজগর সাপ আছে। শঙ্খনাথবাবু কি তাই? আমাকে মোহাচ্ছন্ন করেছেন? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? কোনওদিন ওঁর চোখে লোভ দেখিনি। সরল সহজ মানুষ। তবে কি আমারই দোষ? আমার মন দুর্বল? কিন্তু কী দেখে আমার মন ওঁর দিকে আকৃষ্ট হল! উনি বিবাহিত, স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে। ছি ছি, আমার মন এত অবুঝ? ঘেন্নাপিত্তি নেই?

এই ভালবাসা! এই প্রেম! যোক প্রেম, কিন্তু নিকষিত হেম নয়। প্রেমের এত গুণগান শুনেছি, সব মিথ্যে। চণ্ডীদাস জানতেন প্রেম ভাল নয়, তাতে খাদই বেশী। আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। সারা জন্ম ধরে কাঁদাবে।...

বারোটা বাজল। উনি চোখের ওপর হাত রেখে ঘুমুচ্ছেন, টেবিলের ওপর ঘোমটা-ঢাকা ল্যাম্প জ্বলছে। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আমি আস্তে আস্তে উঠে বাইরে গেলুম।

লবিতে আলো জ্বলছে না, ঘরের আলো দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে অন্ধকারকে একটু স্বচ্ছ করেছে। দেখলুম, লবির এক পাশে দেয়াল ঘেঁষে শিউসেবক একটা কম্বল পেতে শুয়ে আছে। বোধহয় জেগেই ছিল, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল; আমার কাছে এসে খাটো গলায় বলল, মাজী, কিছু দরকার আছে কি?

বললুম, শিউসেবক, তুমি এখানে শুয়েছ ভালই করেছ। এখন কিছু দরকার নেই, যদি দরকার হয় তোমাকে ডাকব।

বহুৎ আচ্ছা মাজী।

শিউসেবক প্রভুভক্ত চাকর। ওকে কেউ এখানে থাকতে বলেনি, নিজে থেকেই আছে। লক্ষ্য করেছি শিউসেবক আর কলাবতী দুজনেই মালিকের অন্ধ ভক্ত। কিন্তু মালিকের স্ত্রীকে বোধহয় একটুও শ্রদ্ধা করে না।

লবির কিনারায় গিয়ে বাইরের অন্ধকারে হাত বাড়ালুম, হাতে বৃষ্টির ছিটে লাগল। এখনও টিপিটিপি চলেছে।

ঘরে ফিরে গেলুম।

চেয়ারে বসেছি, উনি চোখের ওপর থেকে হাত নামিয়ে বললেন, সলিলা ফিরেছে?

না।

আবার চোখের ওপর হাত রেখে শুলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, মেয়েমানুষের দাবাই কী জান? চাবুক। সকালে একবার, রাত্তিরে একবার। তবে তারা শায়েস্তা থাকে।

বললুম, চাবুক লাগালেই পারেন। কে মানা করেছে?

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, ওইটে যে পারি না। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে যদি পারতাম তাহলে কি আমার এ দশা হত।

তবে আর ভেবে কী হবে! ঘুমিয়ে পড়ুন, রাত এখনও অনেক বাকী। আমিও যে মেয়েমানুষ সেকথা আর বললুম না। অবশ্য তিনি একটি বিশেষ মেয়েমানুষকে লক্ষ্য করে কথাটা বলেছিলেন। এবং একথাও আমার বুঝতে বাকী থাকেনি, সলিলা যতই মন্দ হোক তাকে তিনি ভালবাসেন। সলিলা তাঁকে ভালবাসে না, সে অতি নীচ প্রকৃতির মেয়ে; তবু তাকেই তিনি ভালবাসেন, আর কাউকে নয়।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে অনাহত মৃদধ্বনি বেজে চলেছে। কী চুলোর ছাই পেয়ে মৃদঙ্গ বাজছে? কী পেলুম, কী দিলুম?

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। ইনি মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছেন, আবার জেগে উঠেই প্রশ্নভরা চোখে চাইছেন; আমি মাথা নেড়ে উত্তর দিচ্ছি—না, সলিলা আসেনি।

রাত্রি আড়াইটের সময় একবার চুপি চুপি ওপরে গেলুম। পিউয়ের ঘরে দাউ দাউ করে দুটো বালব জ্বলছে; কলাবতী পিউয়ের বিছানায় শুয়ে তাকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। খানিকক্ষণ। দাঁড়িয়ে পিউকে দেখলুম; ইচ্ছে হল কলাবতীকে সরিয়ে আমি পিউকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমুই। কিন্তু–

আজ একবার পাগলামি করেছি, বার বার পাগলামি ভাল নয়। তাছাড়া নীচে রোগী আছেন।

একটা বা নিভিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে গেলুম। রোগী চোখ চেয়ে আছেন। তাঁর চোখের নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তরে বললাম, না, আসেনি। আমি পিউকে দেখতে গিয়েছিলুম।

তিনি আবার চোখের ওপর বাহু রাখলেন।

রাত কেটে গেল, সকাল হল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে; কাঁচা রোদ্র ভিজে আকাশের গায়ে সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে।

রোগীর টেম্পারেচার নিলুম; জ্বর কমেছে, সাড়ে নিরানব্বই। তাঁকে কফি টোস্ট খাওয়ালুম, নিজেও এক পেয়ালা চা খেলুম। শিউসেবককে বললুম, আধ ঘণ্টা পরে এক দাগ ওষুধ খাওয়াবে, তারপর তিন ঘণ্টা অন্তর ওষুধ খাইয়ে যাবে। ব্যাগ তুলে নিয়ে রোগীকে বললুম, আমি এবার চললুম। আর একটু বেলা হলে দাড়িটা কামাবেন।

দরজা পার হয়েছি, পিছন থেকে ডাক এল, শুনে যাও।

ফিরে গিয়ে সামনে দাঁড়ালুম। চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন, একবার তুমি বলবার পর আবার আপনি কেন?

আমি উত্তর দিলুম না, ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। অত রাগারাগির মধ্যেও লক্ষ্য করেছেন। বাসায় ফিরে গিয়ে শুনতে পেলুম শুক্লা নিজের শোবার ঘরে গান গাইছে—অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।

দোরের কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখি, সে স্নান করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। বললুম, ও গান নয় শুক্লা, সেই গানটা গাকে বলে পিরীতি ভাল।

সে চিরুনি হাতে কাছে এসে দাঁড়াল, আমার মুখের পানে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, কী হয়েছে রে?

বললুম, যা হবার তাই হয়েছে। তুই যেমন মরেছিলি, আমিও তেমনি মরেছি। তোর তবু একটা সুরাহা ছিল, জামাইবাবু তোকে ভালবাসতেন। আমার কিছুই নেই।

চোখ থেকে হঠাৎ জল বেরিয়ে এল।

শুক্লা আমাকে জড়িয়ে নিল, তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, যা, আগে স্নান করে ঠাণ্ডা হ, তারপর শুনব।

যেতে যেতে বললুম, আর ঠাণ্ডা! এজন্মে আর ঠাণ্ডা হব না।

পরে শুক্লাকে সব বললুম। আর সাবধান করে দিলুম, জামাইবাবুকে কিছু বলবি না।

সে বলল, তাঁকে কিছু বলতে হবে না। তিনি ডাক্তর, রোগীর মুখ দেখে রোগ ধরতে পারেন। কিন্তু এ আমাদের কী হল ভাই! দুজনের কপালের লেখাজোখা কি একই রকম?

বিকেলবেলা ফোন করলুম, আমি প্রিয়ংবদা। এবেলা শরীর কেমন?

তিনি বললেন, ভালই মনে হচ্ছে। জ্বর বোধহয় নেই। তবে একটু দুর্বলতা আছে।

ডাক্তারের হুকুম মনে আছে তো? দুদিন নড়াচড়া বারণ।

মনে আছে।

বাড়ির খবর কী?

বাড়ির খবর–মানে সলিলার খবর? সে ফেরেনি। যাকগে, যা ইচ্ছে করুক, আমার কী? কথাগুলো ভারি বৈরাগ্যপুর্ণ শোনাল।

পিউ ভাল আছে?

আছে। কাল রাত জেগে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে তো?

কষ্ট! মনে মনে ভাবলুম, আমার কষ্ট তুমি কী বুঝবে? মুখে বললুম, রাত জাগতে আমার কষ্ট হয় না।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল তুমি খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ। রাগ হলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। চাষা মনিষ্যি তো।

বললুম, আপনি চাষা মনিষ্যি নয়। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি, লেখাপড়া শেখেননি কেন?

ধমক দিয়ে বললেন, আবার আপনি!

দু-তিনবার ঢোক গিললুম, তারপর বললুম, আচ্ছা বল, লেখাপড়া শেখনি কেন?

সহজভাবে বললেন, শিখব কখন? বাবা সামান্য চাকরি করতেন; আমার যখন তেরো বছর বয়স তখন তিনি মারা গেলেন। সংসার ঘাড়ে পড়ল। তারপর মা মারা গেলেন, তারপর ছোটবোনটাও মরে গেল। ব্যস, সংসারে আমি একা; আর লেখাপড়ার দরকার কী? রোজগারের ধান্দায় লেগে গেলাম।

ইচ্ছে হল জিগ্যেস করি, এমন বউ যোগাড় করলেন কোত্থেকে? কিন্তু সংকোচ হল, প্রশ্ন করতে পারলুম না। বললুম, আচ্ছা কাল আবার ফোন করব।

আচ্ছা।

ফোন রেখে দিলুম। শরীরের সমস্ত স্নায়ুশিরা যেন টান হয়ে আছে। আবার এবেলা স্নান করব। তারপর খেয়ে ঘুমুব, যত পারি ঘুমুব। যতক্ষণ ঘুমুব অন্তত ততক্ষণ মনটা শান্ত থাকবে।

স্নান করে এসে শোবার ঘরে দোর বন্ধ করলুম। আলো জ্বেলে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। আয়নায় আমার দেহের প্রতিবিম্ব পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে নেবার মত নয়। কিন্তু কতদিন থাকবে এ যৌবন? মেয়েদের যৌবন কতদিন থাকে? সকালবেলার ফোটা ফুল সন্ধ্যেবেলায় শুকিয়ে যায়।

রাত্রি নটার সময় আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। ভেবেছিলুম ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু কোথায় ঘুম! এগারোটা পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লুম। চোখে মুখে জল দিয়ে আলো জ্বেলে ডায়েরি লিখতে বসেছি।

রাত্রি এখন আড়াইটে। বেশ আছি আমি; দিনে ঘুম নেই, রাত্রে ঘুম নেই। একেবারে তপস্বিনী হয়ে গেছি।

# ১৫ ভাদ্র।

এই কয়েক দিনের মধ্যে কত কাণ্ডই না হয়ে গেল। বাবাঃ, যেন কালবোশেখীর ঝড়। শুধু আমার জীবনে নয়, শুক্লার জীবনেও। আজ রবিবার। গত বুধবারে ডাক্তার মন্মথ করের ফোন এল। গলার আওয়াজ আগের মতই মোলায়েম, কিন্তু মনে হয় মখমলের খাপের মধ্যে ধারালো ছুরি ঢাকা আছে। বললেন, মিস ভৌমিক, ভাল আছেন তো? খবর পেলাম শঙ্খনাথবাবুর অসুখ হয়েছিল, আপনি সেবা করতে গিয়েছিলেন। দেখছি শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে আপনার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। আমাকে ডাকবার আগেই তিনি আপনাকে ডাকেন।

।আমার গলা বুজে এল। এ কথার কী উত্তর দেব? তিনি আবার বললেন, আরও শুনলাম ডক্টর নিরঞ্জন দাসকে কল দেওয়া হয়েছিল। আমি শঙ্খনাথবাবুর ফ্যামিলি ডক্টর অথচ তাঁর অসুখে আমাকে না-ডেকে ডাকা হয়েছিল নিরঞ্জন দাসকে। কে ডেকেছিল? আপনি?

হ্যাঁ।

মিস ভৌমিক, শঙ্খনাথবাবুর মেয়ের যখন অসুখ হয় তখন আমিই আপনাকে ডেকে কাজ দিয়েছিলুম। সে কথা এখন আপনার মনে নেই, কারণ শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে এখন আপনার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে—তাছাড়া নিরঞ্জন দাসও আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—

আমি মরিয়া হয়ে বললুম, আপনি ভুল করছেন ডক্টর কর। শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নেই, তিনি আমাকে কল দিয়েছিলেন তাই গিয়েছিলুম। অবশ্য ডক্টর দাস আমার বন্ধু; কিন্তু তিনি। ডাক্তার হিসেবে শঙ্খনাথবাবুকে দেখতে যাননি, ফী নেননি। তাঁকে আমি ডেকেছিলুম, কারণ তাঁর। কথাই আমার আগে মনে পড়েছিল–

তা তো পড়বেই! বাঁকা হাসির সঙ্গে কথাগুলো আমার কানে বিধল—আপনি খাসা আছেন। একদিকে বড়মানুষ শঙ্খনাথ ঘোষ, যিনি গাড়িতে করে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেন; অন্যদিকে বড় ডাক্তার নিরঞ্জন দাস, যিনি রাত দুপুরে আপনাদের বাসায় যাতায়াত করেন। অথচ আমি চায়ের নেমন্তন্ন করলে আপনি সময় পান না!

আমার মুখচোখ গরম হয়ে উঠেছিল, বললুম, আর কিছু বলবার আছে?

তিনি বললেন, বলবার আছে অনেক কিছুই। কিন্তু আপনাকে নয়। যেখানে বললে কাজ হবে সেখানে বলব। আমি আপনার উপকার করেছিলাম আপনি তার চমৎকার প্রতিদান দিয়েছেন, আমাকে সরিয়ে নিরঞ্জন দাসকে ডেকে এনেছেন। একথা আমার মনে থাকবে। আচ্ছা নমস্কার।

টেলিফোন রেখে সেইখানেই বসে রইলুম। কী হবে এখন! হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর শুক্লা এল, তাকে বললুম। তার মুখখানিও সিটিয়ে শুকিয়ে নীল হয়ে গেল।

পরদিন সকাল আটটার সময় আবার টেলিফোন। আমি আর শুক্লা দুজনেই ঘরে ছিলুম, আড়ষ্ট হয়ে টেলিফোনের দিকে চেয়ে রইলুম; যেন টেলিফোন নয়, একটা সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে রয়েছে, এখনই ফণা তুলে ছোবল মারবে। শুক্লা শেষে বলল, তুই ফোন ধর প্রিয়া, আমার হাত-পা কাঁপছে।

ফোন তুলে কানের কাছে ধরলুম, চিঠি সুরে বললুম, হ্যালো!

জামাইবাবুর গলা-প্রিয়ংবদা! শোন, তুমি এখনই একবার আমার বাড়িতে আসতে পারবে? একজনকে নার্স করতে হবে। তাঁর কণ্ঠস্বর দৃঢ়, কঠিন; ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

ভয় কেটে গেল, ব্যগ্র হয়ে বললুম, কী হয়েছে? কাকে নার্স করতে হবে?

তিনি একটু থেমে বললেন, আমার স্ত্রীকে। হঠাৎ তাঁর স্ট্রোক হয়েছে, প্যারালিটিক স্ট্রোক। তুমি ফ্রী আছ? আসতে পারবে?

কিছুক্ষণ কথা কইতে পারলুম না, তারপর বললুম, পারব। আধ ঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পৌঁছব।

বেশ। বাড়ির ঠিকানা জানা আছে, চলে এস। তিনি ফোন রেখে দিলেন।

শুক্লা দাঁড়িয়ে একতরফা কথা শুনছিল। সে বুঝতে পেরেছিল জামাইবাবু ফোন করেছেন এবং একটা গুরুতর কিছু ঘটেছে। সে আমার আঁচল খামচে ধরে শীর্ণ গলায় বলল, প্রিয়া–কী—কী–?

আমার ঘরে আয়, বলছি। হয়তো হয়তো ভগবান তোর পানে মুখ তুলে চেয়েছেন।

শোবার ঘরে কাপড় বদলাতে বদলাতে শুক্লাকে বললুম। সে আমার বিছানায় বসে শুনছিল, আস্তে আস্তে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। তার মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আশা! যে-মানুষ আশা ছেড়ে দিয়েছে সে যদি হঠাৎ আশার আলো দেখতে পায় তাহলে আমচকা ধাক্কা সামলাতে পারে না। আমিও আশা করছি, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আশা করছি, জামাইবাবু যেন মুক্তি পান। শুক্লার জীবন যেন ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

কিন্তু তবু, ভেবে দেখতে গেলে, কিসের জন্যে আশা? একটা মানুষ সাংঘাতিক পীড়িত, সে যেন বেঁচে না-ওঠে এই আশা? খুব উচ্চাঙ্গের আশা নয়। তবু স্বার্থপর মন ওই আশাকেই আঁকড়ে ধরেছে। ভাবছি, জামাইবাবুর মনেও কি এই আশা উঁকিঝুঁকি মারছে?

বললুম, যদি সুবিধে পাই ফোন করব। ব্যাগ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। জামাইবাবুর বাড়িতে কখনও যাইনি, কিন্তু খুঁজে নিতে পারব।

জামাইবাবুর বাড়ি কলকাতার উত্তরাংশে। দোতলা বাড়ি; নীচের তলায় একটা সাধারণ বসবার ঘর, চাকরদের ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার। একজন চাকর সদরে দাঁড়িয়ে ছিল,

আমাকে দেখে বলল, আপনি কি মিস ভৌমিক? এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান, ডাক্তারবাবু ওপরে আছেন।

দোতলায় সিঁড়ির মুখেই একটা ঘর, ড্রয়িং রুমের মত সাজানো। সোফা-সেট আছে, সাজসরঞ্জাম আছে; কিন্তু কিছুরই ছিরিছাঁদ নেই। সব এলোমেলো অপরিচ্ছন্ন।

জামাইবাবু সোফায় বসে একজন বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ডক্টর বর্ধন কলকাতার ডাক্তার-সমাজের মাথার মণি; প্রায় সব ডাক্তারই তাঁর শিষ্য। তিনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি তাঁকে চিনি। আমি যখন ঘরে ঢুকলুম তখন তিনি শান্ত গম্ভীর গলায় বলছেন,...তুমি নিজের হাতে রেখো না আমাকে দেখে থেমে গেলেন।

জামাইবাবু বললেন, না স্যার। এস প্রিয়ংবদা।

ডক্টর বর্ধন বললেন, আমি উঠি। দরকার হলে জানিও।

জানাব স্যার।

ডক্টর বর্ধন চলে গেলেন। জামাইবাবু তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এলেন, আমাকে বললেন, বোস সখি। আমি সোফার একপাশে বসলুম। তিনিও সোফায় বসে কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে কী ভাবলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে একটু ফিকে হেসে বললেন, তোমাকে ডেকে ভুল করেছি সখি। যাহোক, এসেছ যখন দেখে যাও।

কখন কী হল আগে বলুন।

তিনি হেলান দিয়ে বসে উস্কখুস্ক চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, কাল রাত্রি দশটার সময় কেউ একজন ফোন করেছিল...আমি বাড়ি ছিলাম না...ফোন পাবার পর আমার স্ত্রী ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করেন, তারপর রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। আমি এসে দেখি—স্ট্রোক হয়েছে, বাঁ অঙ্গটা পড়ে গেছে।

বললুম, কে ফোন করেছিল জানা গেছে কি?

তিনি চকিত হয়ে চাইলেন, না। তুমি জান?

জানি। মন্মথ কর। বলে কাল বিকেলের ঘটনা বললুম।

তিনি একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, হুঁ। আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। মন্মথ করের উদ্দেশ্য কিন্তু সিদ্ধ হল না, সে যা চেয়েছিল তার উল্টো ফল হল।—এস।

তিনি আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। খাটের পায়ের কাছে একজন ঝি দাঁড়িয়ে আছে, আর খাটে শুয়ে আছেন একটি মহিলা। আগে তাঁকে দেখিনি, এই প্রথম দেখলুম। লম্বা হাড়ে-মাসে শরীর, মুখে বেশী মাংস নেই, রঙ লালচে সাদা, ঘন জোড়া-ভুরু, নাকটা মুখের ওপর খাঁড়ার মত উঁচু হয়ে আছে। মুখের বাঁ দিকটা রোগের আক্রমণে বেঁকে

গেছে। তুব যৌবনকালে ইনি উগ্র ধরনের সুন্দরী ছিলেন তা এখনও বোঝা যায়। ইনিই ডক্টর নিরঞ্জন দাসের স্ত্রী।

আমরা খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। রোগিণী আমাদের দিকে মাথা ঘোরাতে পারলেন না, কেবল চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। মানুষের চোখে এমন বিষাক্ত আক্রোশ আর বোধহয় কখনও দেখিনি। চমকে উঠতে হয়। তারপর তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল; বিকল স্বরযন্ত্রের আওয়াজ, কিছু বোঝা গেল না। জামাইবাবু তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবে?

আবার তাঁর মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ বেরুল, যার মানে বোঝা না-গেলেও মনের ভাব বুঝতে কষ্ট হয় না। জামাইবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, চল, আমাদের দেখে উনি উত্যক্ত হচ্ছেন।

বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে জামাইবাবুর মুখের পানে চাইলুম। তিনি বললেন, ভেবেছিলাম নিজেই চিকিৎসা করব, তোমরা দেখাশোনা করবে। কিন্তু মাস্টারমশাই যা বলে গেলেন তারপর আর তা সম্ভব নয়। স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনিবনাও নেই একথা জানাজানি হয়ে গেছে, এমনকী মাস্টামশায়ের কানে পর্যন্ত উঠেছে। আমার চিকিৎসায় যদি কিছু মন্দ ফল হয় বুঝতে পারছ? তার চেয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। সেখানে অন্য ডাক্তার চিকিৎসা করবেন, আমার কোনও দায়। থাকবে না। আমি কেবল বাইরে থেকে দেখাশোনা করব।

জিগ্যেস করলুম, রোগের প্রগনসিস্ কী রকম?

মাথা নেড়ে বললেন, কিছু বলতে পারি না। অবশ্য আরাম হবার কোনও আশাই নেই, কিন্তু এই অবস্থায় পাঁচ বছর বিছানায় শুয়ে থাকাও সম্ভব।

বুক দমে গেল। তিনি আমার মনের অবস্থা বুঝে একটু হেসে বললেন, সখি, দুনিয়ার কাছে কিছু আশা কোরো না, তাহলেই ধাক্কা খাবে। সংসার নিজের নিয়মে চলে, আমাদের আশা-আকাঙক্ষার তোয়াক্কা রাখে না। চল, গাড়িতে তোমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্রায় আঁতকে উঠলুম, আপনি ওখানে যাবেন?

তাঁর মুখে কেমন একরকম হাসি ফুটে উঠল; তার কতকটা ব্যঙ্গ কতকটা আত্মগ্লানি। বললেন, এখন আর ভয় কিসের? লজ্জাই বা কিসের? আমি অবশ্য কোনওদিনই লজ্জা করিনি, কিন্তু কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় ছিল; এখন আর তাও নেই।–চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে হাসপাতালে যাব। সেখানে একটা প্রাইভেট ক্যাবিনের ব্যবস্থা করে আজই রুগীকে রিমুভ করতে চাই।

বাসার সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, শুক্লাকে বলল যেন বেশী বিচলিত না হয়। আমি যদি পারি রাত্তিরে আসব।

শুক্লা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, আমি আসতেই আমাকে খামচে ধরল,—ফিরে এলি যে?

যা দেখেছি যা শুনেছি সব তাকে বললুম, সে আমাকে খামচে ধরে বসে রইল। শেষে ভয়-জড়ানো সুরে বলল, কী হবে প্রিয়া?

বললুম, জামাইবাবু বলেছেন, দুনিয়ার কাছে কিছু আশা কোরো না, তাহলেই ধাক্কা খাবে। তোকে বেশী বিচলিত হতে মানা করেছেন। আজ রাত্তিরে হয়তো আসতে পারেন।

শুক্লা কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজে বসে রইল, তারপর উঠে স্নান করতে চলে গেল। স্নান করে যখন ফিরে এল তখন তার মুখ দেখে বুঝলুম, সে মন শক্ত করেছে। উঃ, আশা মানুষের মনকে কী দুর্বলই করে দিতে পারে।

জামাইবাবু কিন্তু রাত্তিরে এলেন না, বাড়ি থেকে ফোন করলেন,—আজ হাসপাতালে ক্যাবিন পাওয়া গেল না। কাল একটা খালি হবে। আজ তোমাদের বাসায় যেতে পারব না, রোগীর কাছে থাকতে হবে।

আমি যাব?

না, তাতে বিপরীত ফল হতে পারে। শুক্লাকে ফোন দাও, তার সঙ্গে দুটো কথা বলি।

শুক্লার হাতে ফোন দিয়ে আমি সরে গেলুম—

পরদিন শুক্রবার। সন্ধ্যের পর জামাইবাবু এলেন। আমি নিজের ঘরে ছিলুম, বেরিয়ে এসে শুক্লার ঘরে গলার আওয়াজ পেয়ে সেই দিকে গেলুম। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখি, জামাইবাবু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আর শুক্লা তাঁর বুকে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছে।

পা টিপে টিপে সরে আসছিলুম, জামাইবাবু হাত নেড়ে বললেন, সখি, এদিকে এস। তুমি। শুক্লাকে বোঝাও যে এবার বিয়ে করলে কেউ নিন্দে করবে না।

আমি সসংকোচে ঘরে ঢুকলুম; ওরা যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জা করতেও ভুলে গেছে। জামাইবাবু বললেন, এত বোঝাচ্ছি কিছুতেই বুঝছে না।

শুক্লা মাথা নেড়ে কান্না-ভরা গলায় বলল, না, আমি বুঝব না। তুমি আমাকে লোভ দেখিও। এখন বিয়ে করলে সবাই তোমায় ছি ছি করবে, শহরে কান পাতা যাবে না। তুমি শ্রদ্ধা হারাবে, সম্মান হারাবে, পসার হারাবে। সে আমি কিছুতেই হতে দেব না।

জামাইবাবু বললেন, এখন ছি-ছির কিছু বাকী আছে? তোমার-আমার কথা সবাই জানতে পেরেছে।

তা জানুক। তাতে আমার নিন্দে, তুমি পুরুষমানুষ, তোমার নিন্দে নেই। কিন্তু যদি বিয়ে কর, সবাই জো পেয়ে যাবে। তুমি গাইনকোলজিস্ট, কেউ তোমাকে মেয়েদের চিকিৎসা করতে ডাকবে না।

জামাইবাবু গাঢ়স্বরে বলে উঠলেন, কিন্তু শুক্লা, আমি যে সংসার চাই, ছেলেমেয়ে চাই—

আর আমি কি চাই না? শুক্লা ভিজে চোখ তুলে তাঁর মুখের পানে তাকাল।

হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল। ওদের মনের এই দিকটা এতদিন দেখতে পাইনি। সন্তানের জন্যে কী তীব্র কামনা ওদের মনে। সাধারণ পাঁচজনের মত সংসারের সাধ, সন্তানের সাধ। অথচ বর্তমান অবস্থায় তা তো হবার নয়। তাই জামাইবাবু শুক্লাকে বিয়ে করবার জন্যে এমন ক্ষেপে উঠেছেন। কিন্তু শুক্লা তা হতে দেবে না; বুক ফেটে গেলেও সে জামাইবাবুর এতটুকু অনিষ্ট হতে দেবে না।

শেষ পর্যন্ত জামাইবাবু রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, আমি হাত ধরে ফিরিয়ে আনলুম,—না-খেয়ে যেতে পাবেন না।

তাঁর রাগ কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। খানিক পরেই হেসে বললেন, বিয়ে না করলে তো বয়ে গেল, গোঁফজোড়াতে দিলে চাড়া তোমার মত অনেক মেয়ে পাব। কিন্তু একটা কাজ তো করতে পার; আমার বাড়িটা গরুর গোয়াল হয়ে আছে, সেটাকে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে দিতে পার। করবে?

আমি বলে উঠলুম, নিশ্চয় পারব। আমরা দুজনে মিলে আপনার বাড়ি তকতকে ঝকঝকে করে দেব। কি বলিস শুক্লা?

শুক্লার কান্না-বোয়া চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

আমি বললুম, কাল সকালেই আমরা যাব। একদিনে যদি কাজ শেষ না হয় পরশুও যাব। আপনার বাড়ির পঙ্কোদ্ধার করে ছেড়ে দেব। অনেক খরচ কিন্তু। দরজা-জানলার পর্দা ফেলে দিতে হবে, সোফা-সেটের স্প্রিং গদি সব বদলাতে হবে। পাঁচশো টাকার কমে হবে না। দেবেন তো?

জামাইবাবু ভীষণ খুশি হলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর কিন্তু তিনি রইলেন না। হাসপাতালে গিয়ে স্ত্রীর রিপোর্ট নেবেন, তারপর বাড়ি যাবেন।

পরদিন, অর্থাৎ কাল সকালবেলা, চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। শুক্লার একটু ভয়-ভয় ভাব, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করছে না। বাড়িতে পৌঁছে দেখলুম, জামাইবাবু কাজে বেরিয়ে গেছেন; চাকর বলল, আমার নাম সুবোধ। বাবু হুকুম দিয়ে গেছেন আপনাদের যা চাই সব জোগাড় করে দিতে। আমি দুটো জন-মজুর ডেকে এনেছি। আর কী কী চাই হুকুম করুন।

আমি বললাম, আমরা আগে বাড়িটা আগাগোড়া দেখতে চাই।

আজ্ঞে আসুন, বলে সুবোধ আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। আড়চোখে লক্ষ্য করলুম, শুক্লার চোখে জল এসেছে। আমি আর তার পানে তাকালুম না।

বাড়িতে একটা চাকর একটা ঝি, সুবোধ আর শশী। তাছাড়া রান্নার জন্য বামুন-মেয়ে আছে। মোটর-ড্রাইভার পঞ্চুও বাড়িতেই থাকে। নীচের তলাটা অত্যন্ত অপরিষ্কার; রান্নাঘর জলে কাদায় একটু হয়ে আছে; ছাতলাধরা কলতলাতে পা দিতে ভয় করে। জামাইবাবুর অর্ধাঙ্গিনী শুধু চেঁচাতে পারতেন, সুগৃহিণী ছিলেন না।

সুবোধকে ডেকে বললুম, খানিকটা চুন আর বালি আনিয়ে নাও; আর নারকেল ছোবড়া। মজুর দুটোকে লাগিয়ে দাও, তারা ঘষে-মেজে কলতলা পরিষ্কার করুক।

সুবোধ আজ্ঞে বলে চলে গেল।

বামুন-মেয়ে ধোঁয়া-ভরা রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল। বেঁটে মোটা আধবয়সী মেয়েমানুষ, চোখ-ভরা কৌতূহল। তাকে ডেকে বললুম, আজ দুপুরবেলা আমরা দুজনে এখানে খাব। ডাক্তারবাবুও খাবেন। সে থানের আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে ঘাড় নাড়ল। আমাদের কী ভাবল কে জানে!

নীচেরতলার মোটামুটি ব্যবস্থা করে আমরা ওপরে গেলুম। ওপরতলার অবস্থা ওরই মধ্যে ভাল, কিন্তু তবু দেখলে গা কিচকিচ করে। জানলার কাছে এত ময়লা জমেছে যে আলো

ঢোকে না, মেঝে এত নোংরা যে মোজেইকের কাজ প্রায় দেখা যায় না। তাছাড়া জানলা-দরজার পর্দা খাট বিছানা চেয়ার টেবিল টেনে ফেলে দিলেই হয়। শশী-ঝি ওপরে ছিল, আমাদের দেখে কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে বললাম, তুমি বাড়ির ঝি? এ কী অবস্থা করে রেখেছ বাড়ির? বাড়িতে কি ঝটপাটও পড়ে না?

শশী-ঝি বুঝেছিল আমরা হেঁজিপেঁজি নই, তাই নাকি সুরে আরম্ভ করল, আমি একা মানুষ, কোন্ দিক দেখব মা। নীচে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা; ওপরে গিন্নী-ঠাকরুনের ফাইফরমাস, পান সাজা। তার ওপর মুখঝামটা। সারাদিন ওপর আর নীচে, ওপর আর নীচে। একটা গতরে কত সামলাব?

বললুম, আচ্ছা, হয়েছে। বাড়িতে গুঁড়ো সাবান আছে?

শশী বলল, আছে মা, কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবান আছে।

বেশ। নীচে গিয়ে এক বালতি জল গরম করে তাতে গুঁড়ো সাবান দিয়ে নিয়ে এস। ঘরদোর সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

হ্যাঁ মা, বলে শশী চলে গেল।

আমি আঁচল দিয়ে গাছ-কোমর বাঁধতে বাঁধতে শুক্লাকে বললুম, নে কোমরে আঁচল জড়া। তোকেও কাজ করতে হবে। তোর ঘর-দোর আমি একা পরিষ্কার করতে পারব না।

শুক্লা লাল হয়ে উঠল, তারপর কোমরে আঁচল জড়াতে লাগল।

দুপুর পেরিয়ে জামাইবাবু এলেন। সঙ্গে অনেক খাবার এনেছেন; মধুক্ষরার নিখুঁতি, দই সন্দেশ। বাড়ি দেখে বললেন, আরে বাঃ! বাড়ির চেহারা ফিরে গেছে। তোমাদের খাবার কী ব্যবস্থা হয়েছে জানি না, তাই বাজার থেকে খাবার এনেছি।

বামুন-মেয়ে অবশ্য রান্নাবান্না করে রেখেছিল। ওপরে খাবার দিয়ে গেল, আমরা তিনজনে একসঙ্গে বসে খেলুম। তারপর খানিকক্ষণ গল্পসল্প করে আমাদের হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে জামাইবাবু চলে গেলেন।

আমরাও বাজার করতে বেরলুম। পর্দা, বিছানার চাদর, মশারি, বালিশ, কত কী যে কিনতে হবে ঠিক নেই।

সন্ধ্যের পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। এ আমার ভালই হয়েছে, নিজের কথা ভাববার সময় পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে যাচ্ছে তখন বুকের মধ্যে খচ খচ করে উঠছে।

স্নান করে তাড়াতাড়ি রাত্রির খাওয়া খেয়ে নিলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম। সারারাত্রি খুব ঘুমিয়েছি, একবারও ঘুম ভাঙেনি। রাত্রে জামাইবাবু এসেছিলেন কি না তাও জানতে পারিনি।

আজ সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, আকাশে মেঘ জমেছে, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

কাল জামাইবাবুর বাড়ির কাজ শেষ হয়নি; আমরা দুজনে চা খেয়ে বেরুতে যাচ্ছি, টেলিফোন বেজে উঠল। হয়তো জামাইবাবু, তাঁর স্ত্রীর কোনও খবর আছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলুম। কিন্তু জামাইবাবু নয়, শঙ্খনাথবাবু। গলার আওয়াজ ভারী-ভারী। বললেন, তুমি আছ? আমি এখনি যাচ্ছি।

কী হয়েছে?

মুখেই বলব।

আচ্ছা, আসুন।

ফোন রেখে শুক্লাকে বললুম, শঙ্খনাথবাবু আসছেন। কী দরকার বললেন না। তুই বরং এগিয়ে যা, আমি পরে যাব।

শুক্লা বলল, না, দুজনে একসঙ্গে যাব।

পনেরো মিনিট পরে খট্ খট্ করে দোরের কড়া নড়ে উঠল। গাড়ি কখন এসেছে জানতে পারিনি; দোর খুলে দেখি, সামনে শঙ্খনাথবাবু, তাঁর পিছনে পিউকে কোলে নিয়ে কলাবতী।

ইটের পাঁজায় আগুন দিলে বাইরে থেকে আগুন দেখা যায় না, কিন্তু কাছে গেলে গায়ে আঁচ লাগে। উনি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন তখন আমার গায়ে যেন আঁচ লাগল। কী হয়েছে? ভয়ঙ্কর একটা কিছু হয়েছে। পিউকে নিয়ে উনি এসেছেন কেন?

আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না, নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। উনি তখন কথা বললেন। যেন অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে রেখেছেন এমনইভাবে বললেন, প্রিয়দম্বা, পিউকে নিয়ে এসেছি, সে দিনকতক তোমার কাছে থাকবে।

এই কথা শুনে আমার অবস্থা কী হল তা আমি বোঝাতে পারব না, শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—পিউ আমার কাছে থাকবে!

হ্যাঁ। আমি–

শুক্লা আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলল, আগে ঘরে এসে বসুন। এই বুঝি পিউ? ওমা, এ তো মেয়ে নয়, এ যে চাঁদের কণা। এই বলে পিউকে কলাবতীর কোল থেকে কেড়ে নিল।

শঙ্খনাথবাবু ঘরে এসে বসলেন,—আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। পিউকে তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।

আমরা দেয়ালে-আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষে বললুম, কিন্তু–কিন্তু–হঠাৎ–

তিনি পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে টেবিলের উপরে রাখলেন, বললেন, এই টাকা রইল, যা দরকার হয় খরচ কোরো। কলাবতীকে এখানে রাখলে ভাল হত; কিন্তু ওর নিজের বাচ্চা আছে, তাকে ছেড়ে এখানে থাকতে পারবে না। ও দুবেলা এসে পিউকে খাইয়ে যাবে।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কতদিনের জন্যে যাচ্ছেন?

কিছু ঠিক নেই। দশ-পনরো দিনের মধ্যেই ফিরব বোধহয়।

তিনি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে আমার আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। বললুম, কী হয়েছে আমি জানতে চাই।

এতক্ষণ তিনি সংযতভাবে কথা বলছিলেন, এবার একেবারে হুঙ্কার ছেড়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। শুক্লা তাই দেখে পিউকে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালাল, কলাবতী তার পিছু পিছু গেল। শঙ্খনাথবাবু বললেন, কী হয়েছে। যা হবার তাই হয়েছে। সলিলা পালিয়েছে।

ওই শালা লটপট সিংয়ের সঙ্গে পালিয়েছে। আমাকে মিছে কথা বলেছিল, বাপ আসেনি, কেউ আসেনি। সেই রাত্রেই পালিয়েছে।

মনটা যেন অসাড় হয়ে গেল। সেই রাত্রেই সলিলা আমার চোখের সামনে স্বামীকে ছেড়ে আর-একজনের সঙ্গে চলে গেছে। কিন্তু–

প্রশ্ন করলুম, আপনি কী করে জানলেন যে ওই লোকটার সঙ্গেই পালিয়েছে?

বললেন, আমি জানতে পেরেছি। ডাক্তার মন্মথ কর কাল রাত্রে টেলিফোন করেছিল—সে দেখেছে হাওড়া স্টেশনে সলিলা আর লেফটেনেন্ট লট্পট্ সিং একসঙ্গে ট্রেনে উঠছে।

এখানেও মন্মথ কর। পরের জীবনের গুপ্ত রহস্য খুঁজে বেড়ানই বোধ হয় ওর কাজ।

আমি ভেবেছিলাম সলিলা ঝগড়াঝাঁটি করে বাপের কাছে চলে গেছে। ইচ্ছে করেই খোঁজ নিইনি, আসবার হয় আপনি আসবে। এখন দেখছি বাপ নয়, নাগরের সঙ্গে পালিয়েছে। শুধুহাতে যায়নি, নিজের গয়নাগাঁটি যা ছিল সব নিয়ে গেছে। যাকগে, চুলোয় যাক গয়না। আমি চললুম। পিউকে দেখো।

তিনি দোরের দিকে চললেন। আমার মাথার মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে গেল, ছুটে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম,—সলিলা পালিয়েছে কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়? সলিলাকে ফিরিয়ে আনতে? অকে ফিরিয়ে এনে আবার ঘরকন্না করবে?

তিনি গর্জে উঠলেন, না, ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি না। সে আমার মুখে চুনকালি দিয়েছে, তারই জবাব দিতে যাচ্ছি।

জবাব! কী জবাব দেবে তুমি?

এই যে জবাব। এই বলে পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে দেখালেন। পিস্তল আগে কখনও দেখিনি, সিনেমায় দেখে তার চেহারা জানা ছিল। কাঁপতে কাঁপতে বললুম, খুন করবে?

দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, কুকুরের মত গুলি করে মারব জানোয়ার দুটোকে।

কিন্তু–কিন্তু যদি ধরা পড়?

ধরা পড়ি, ফাঁসি যাব।

না না, আমি তোমাকে যেতে দেব না–

তারপর মুহূর্তের জন্যে বোধ হয় জ্ঞান ছিল না, যখন জ্ঞান হল দেখি সিঁড়ির দরজা ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, উনি চলে গেছেন।

# ৮ আশ্বিন।

তিন হপ্তা হল লোকটা চলে গেছে, আর কোনও খবর নেই।

পিউ আমার কাছে আছে। পিউকে না পেলে বোধ হয় মরে যেতুম। ও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

কাজকর্ম মাথায় উঠেছে। কাজের ডাক যখন আসে তখন বলি, আমার সময় নেই, অন্য কাজ আছে। পিউ এখন আমার একমাত্র কাজ। ওর পিতৃদেব এক হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন পিউয়ের খরচ চালাবার জন্যে। সে টাকা আমি পিউয়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছি। পিউয়ের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার আছে।

কী মেয়ে পিউ! একবার কাঁদল না, একবার বলল না, বাড়ি যাব। যেন এই বাসাটাই তার চিরদিনের ঘরবাড়ি। আমি তার চিরকালের আপনজন। জানি না, হয়তো আগের জন্মে ওকে পেটে ধরেছিলুম।

দম্মা দম্মা দম্মা–সারাক্ষণ খালি দম্মা। পুতুল নিয়ে খেলা করছে, হঠাৎ ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল-দম্মা! কোলের মধ্যে কিছুক্ষণ মুখ গুঁজে থেকে, ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে আবার গিয়ে খেলা করতে লাগল। আমি রাগ দেখিয়ে বলি, তুই আমাকে দম্মা বলবি কেন?

ঘাড় হেলিয়ে মিটিমিটি হেসে তাকায়, বলে, উঁ!

প্রিয়ংবদা বলতে পারিস না?

আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে,–পি-ও-দম্মা?

তবে রে। চড় তুলে ছুটে যাই, সে খিলখিল করে হেসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। দুষ্টু কি কম?

চুপিচুপি জিগ্যেস করি, হ্যাঁরে, তোর মা কোথায়?

মা নেই-নেই। বলে আবার খেলা শুরু করে। মা সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ নেই; মাকে ও চেনে না।

ওকে মায়ের কথা একেবারে ভুলিয়ে দিতে হবে। বড় হয়ে যেন জানতে না পারে, ওর মা কুলত্যাগিনী। কিন্তু কী করে ভোলানো যায়? একমাত্র উপায়, ও যদি আর কাউকে মা বলে চিনতে শেখে। একদিন শুক্লা আর জামাইবাবুর সামনে কথা উঠেছিল, জামাইবাবু গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, সখি, তুমি এক কাজ কর। ওকে শেখাও তোমাকে মা বলতে, তাহলে সব গোল মিটে যাবে। ওঁর কথা শুনে চুপিচুপি উঠে পালিয়ে এসেছিলুম। উনি

সব জানেন, শুক্লা যদি নাও বলে থাকে, উনি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ও আমি পারব না, মনে যাই থাকুক।

রাত্রে পিউকে আমি নিজের কাছে নিয়ে শুই। শোবার ঘরে একটা নাইটল্যাম্প লাগিয়েছি, সারারাত সেটা জ্বলে। রাত্তিরে দু-তিনবার পিউয়ের ঘুম ভাঙে, ঘর অন্ধকার দেখলে ভয় পায়। ওকে রাত্তিরে কোলের কাছে নিয়ে যখন শুই, কত কথা মনে আসে। একদিন ভেবেছিলুম, পরের সোনা কানে দেব না, কিন্তু এখন? সেই সোনা শিকল হয়ে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরেছে, কিন্তু কই, ছাড়াবার চেষ্টা তো করছি না!...চেষ্টা করব কোত্থেকে? একটা দুর্দান্ত বর্বর যে আমার মাথা খেয়ে দিয়ে চলে গেছে। আমার লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, আত্মসম্মান নেই, কিছুই নেই—

ওর কথা আমি ভাবি না, ভাবতে চাই না; জোর করে ওর চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখি। কিন্তু গভীর রাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে দুশ্চিন্তা এসে মনকে জুড়ে বসে। কোথায় চলে গেল মানুষটা! সারা ভারতবর্ষ একটা অপদার্থ স্ত্রীলোকের পিছনে পিস্তল নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ধরতে পারবে কি? যদি ধরতে পারে খুন না করে ছাড়বে না। তারপর? খুন করে পুলিসের হাত এড়ানো কি সহজ? ধরা পড়ে যাবে; হয়তো খুন করে নিজেই গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা দেবে। তারপর—আদালতে খুনের বিচার! আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পিউকে বুকে আঁকড়ে চোখ বুজে পড়ে থাকি।

আগে আমার খবরের কাগজ পড়া অভ্যেস ছিল না, আজকাল রোজ পড়ি। ভয় করে, বুক দুরদুর করে, তবু না পড়ে আমি পারি না। হয়তো কাগজ খুলে দেখব, অমুক তার পলাতকা স্ত্রীকে খুন করেছে। ভগবানের দয়ায় এখনও সেরকম খবর চোখে পড়েনি। যদি খুঁজে না পায়, যদি হতাশ হয়ে ফিরে আসে, বেশ হয়। পিউকে এত ভালবাসে তার কাছে ফিরে আসতে কি মন চায় না?

পিউ কিন্তু এখন আমার হয়ে গেছে। এখন যদি ওর বাপ এসে মেয়ে ফেরত চায়, বলব, দেব না। মেয়ে, যাও তুমি বাউণ্ডুলের মত বউ খুঁজে বেড়াওগে। পিউকে আমি ছাড়ব না। পিউও আমাকে। ছেড়ে কক্ষনো বাপের কাছে যেতে চাইবে না।

কিন্তু–তা কি পারব? ও এসে যদি হাত পেতে দাঁড়ায়, আমি না বলতে পারব কি? হা ভগবান, এ তুমি আমার কী করলে? ও একটা নেকড়ে বাঘ, একটা অজগর সাপ। ও যদি হাত পেতে দাঁড়ায় আমি বলব—তোমাকে না বলবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমাকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেল, আমি নিশ্চিন্দিহই।...

কলাবতী রোজ সকাল-সন্ধ্যে আসে। শিউসেবক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, আবার পিউয়ের খাওয়া হলে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যেবেলা কলাবতী বেশীক্ষণ থাকে না, পিউ ঘুমিয়ে পড়লেই চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা যখন আসে, পিউকে খাইয়ে দুদণ্ড পা ছড়িয়ে বসে গল্প করে। আমি তাকে চা জলখাবার দিই, সে তাই খেতে খেতে বাঁকা বাঁকা হিন্দীতে কথা বলে।

ওদের দেশ ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিমে। ভারত যখন ভাগ হল তখন ওরা পড়ে গেল পাকিস্তানে। সেই মারামারি কাটাকাটি নিষ্ঠুর পাশবিকতার মধ্যে থেকে কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ওরা নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে এসেও ওদের দুর্দশা ঘুচল না। খাদ্য নেই, মাথা গোঁজবার জায়গা নেই; মীরাটের রাস্তায় রাস্তায় ওরা কেঁদে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় শঙ্খনাথবাবু কী কাজে মীরাটে ছিলেন, ওরা তাঁর নজরে পড়ে যায়। তিনি ওদের কলকাতায় নিয়ে আসেন। সেই থেকে ওরা ওঁর কাছে আছে। উনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ মদেব।

মহাদেবের মহাদেবীর প্রতি কিন্তু কলাবতীর মোটেই ভক্তি নেই। ওদের চোখের সমানেই সলিলা বিয়ে হয়ে এসেছে। প্রথমে সলিলার রূপ দেখে ওরা মুগ্ধ হয়েছিল, তারপর যতই সলিলার গুণ প্রকাশ হতে লাগল, ততই ওদের ভক্তি চটে যেতে লাগল। পিউ জন্মাবার পর ওদের মন সলিলার ওপর একেবারে বিষিয়ে উঠল; পিউকে সলিলা দেখে না, নিজের নাচ গান আমোদ নিয়ে মত্ত থাকে। কলাবতী আমাকে বলল, মাজী, বহুর রূপ আছে বটে, কিন্তু সে ভাল মেয়ে নয়; আমার বাবুজীর উপযুক্ত বহু নয়। ছোট ঘরের মেয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে কি তয়ফাওয়ালীর মত নেচে বেড়ায়? ছি ছি ছি। ও চলে গেছে ভালই হয়েছে। ওরকম মেয়ে কখনও ঘরে থাকে না। এখন ভগবানের কাছে জানাচ্ছি, আমার বাবুজী যেন ঘরে ফিরে আসেন, একটি ভদ্রলোকের মেয়ে বিয়ে করে শান্তিতে থাকেন।

কলাবতী রোজ সকালে পিউয়ের ঘুম ভাঙবার আগেই এসে হাজির হয়। একদিন বেচারী আসতে পারেনি। সে কী কাণ্ড! সকালবেলা চোখ চেয়েই পিউ বলল, কলা খাব। কিন্তু

কোথায় কলা! তাকে ভোলাবার চেষ্টা করলুম,-আজ কলা নেই-নেই। আজ তুমি বোতলে করে দুধু খাবে। কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে–

কে কার কথা শোনে? পিউ বিছানায় শুয়ে শুয়েই কান্না শুরু করল,—কলা খাব। সে সহজে কাঁদে না, কিন্তু ঠিক সময়ে কলা না পেলে রক্ষে নেই।

তার কান্না শুনে শুক্লা দোরের কাছে এসে দাঁড়াল,—পিউ-মেয়ে কাঁদে কেন?

কলাবতী আসেনি, তাই কাঁদছে। আমি পিউয়ের পাশে শুয়ে তাকে আদর করে বললুম, ছি কাঁদতে নেই। তুমি এখন বড় হয়েছ, কাঁদলে লোকে নিন্দে করবে। বলবে—পিউ দুই মেয়ে, পিউ কথা শোনে না। আমি এক্ষুনি তোমার জন্যে দুধ আনছি—

পিউ কান্না থামিয়ে বিছানায় উঠে বসল, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল; যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে। তারপর দম্মা খাব বলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার বুকের মধ্যে মুণ্ডু গুঁজে দিলে। রাসী।

কী করি আমি তখন দিশেহারা হয়ে শুক্লার পানে তাকালুম। মুখপুড়ী আমার দশা দেখে মুখে আঁচল খুঁজে হাসছে।

পিউ কিন্তু ভারী ঠকে গিয়েছিল সেদিন।

শুক্লা পিউকে ভালবাসে। সেই প্রথম দিন ওকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল, তারপর থেকে কিন্তু বেশী কাছে আসে না। যখন বাইরে যায় ওর জন্য কত রকম খেলনা কিনে নিয়ে আসে; কিন্তু নিজে দূরে দূরে থাকে। আমি তা লক্ষ্য করেছিলুম; একদিন জিগ্যেস করলুম, তখন সে ম্লানমুখে বলল, না ভাই, আমি ওকে ছোঁব না। জানিস তো আমাদের পেটে কী প্রচণ্ড ক্ষিদে। পিউকে ছুঁলে ওর যদি অনিষ্ট হয়। যদি নজর লাগে।

সত্যি ওদের জীবন কেমন যেন দড়কচাপড়া হয়ে আছে। সন্তানের জন্যে দুজনেই পাগল, কিন্তু উপায় নেই। জামাইবাবুর স্ত্রী হাসপাতালে আছেন; জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু তিনি মরবেনও না, সেরেও উঠবেন না। কতদিন এইভাবে চলবে কেউ বলতে পারে না। আমার এক-এক সময় অসহ্য মনে হয়, ইচ্ছে হয় হাসপাতালে গিয়ে মহিলাটির গলা টিপে দিই। কিন্তু জামাইবাবুর ধৈর্য আছে বলতে হবে। হাসিমুখে কর্তব্য করে যাচ্ছেন। ওঁর প্রাণের ব্যথা শুক্লা জানে আর আমি জানি।

শুক্লা মাঝে মাঝে জামাইবাবুর বাড়িতে যায়, ঘরকন্না তদারক করে আসে। আমার সেই প্রথম। দিনের পর আর যাওয়া হয়নি। শুনেছি, বাড়ির এখন ছিরি ফিরেছে। কিন্তু ছিরি ফিরলে কী হবে, সবই ঝি-চাকরের হাতে। জামাইবাবু একলা মানুষ, বেশীর ভাগ সময় বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। শুক্লা তো সেখানে গিয়ে থাকতে পারে না। জামাইবাবু কাশী থেকে মাকে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, কাশী ছাড়তে চান না। বুড়ি ঝিটাও কয়েক বছর আগে মরে গেছে।

এদিকে পুজো এসে পড়ল। এখনও পুজোর বাজার হয়নি। একদিন কালবতীকে পিউয়ের কাছে বসিয়ে আমি আর শুক্লা যাব বাজার করতে। শুক্লা কেবল একটা শাড়ি কিনবে; আমিও নিজের জন্যে বিশেষ কিছু কিনব না, কিন্তু পিউয়ের জন্যে জুতো জামা সব কিনব। ভাবছি ওর শীতের পোশাকও এই সময় কিছু কিনে রাখব; এক সেট ভাল অ্যাঙ্গোরা উলের পোশাক। কলাবতীর জন্যেও একখানা শাড়ি কিনতে হবে। ওর বাবুজী বাড়ি নেই, পুজোর সময় ও যদি নতুন শাড়ি না পায়, ওর মনে দুঃখ হবে।

বাবুজী যে কবে ফিরবেন তা বাবুজীই জানেন।

# ৩ কার্তিক।

দরশ বিনু দুখন লাগে নয়ন–শুক্লা নিজের ঘরে অলস গলায় মীরার ভজন গাইছে।

ও কেন এ গান গায়? ওর তো দরশ পাবার কোনও অসুবিধে নেই। ও কেন বিরহের গান গায়?

রাজবধু মীরা। গিরিধরকে কী ভালই বেসেছিল। কিছু চায়নি সে গিরিধরের কাছে। বলেছিল–গিরিধর যদি আমাকে বিক্রি করে দেয় আমি বিক্রি হয়ে যাব। হয়তো ভগবানকেই এত ভালবাসা যায়; মানুষকে কি মানুষ এত ভালবাসতে পারে? মানুষকে মানুষ ভালবাসে রক্তমাংস দিয়ে, যেমন দিতে চায় তেমনই পেতে চায়। ঠাকুর, তোমাকে মীরার মত ভালবাসার শক্তি আমার নেই। আমি একটা মানুষকে ভালবেসেছি, রক্তমাংস দিয়ে ভালবেসেছি। তোমার কাছে সে ভালবাসার কি কোনও দাম নেই?

পুজো এল, চলে গেল। মহাষ্টমীর দিন পিউকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম, ঠাকুর দেখে কী খুশি! তাকে বললুম, পিউ, হাত-জোড় করে ঠাকুরকে প্রণাম কর; বল—ঠাকুর, আমাদের সকলের ভাল কর। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করল। বিজবিজ করে কী বলল তা কিন্তু বোঝা গেল না। ঠাকুর হয়তো বুঝেছেন।

কার্তিক মাস আরম্ভ হয়ে গেছে। দেড় মাস হয়ে গেল, একটা খবর নেই। কোথায় গেছেন, কিছু জানবার উপায় নেই। কাউকে জিগ্যেস করবার নেই। বেঁচে আছেন তো?

ভাবতে পারি না, মাথা গোলমাল হয়ে যায়। রাত্রে পিউকে বুকের কাছে নিয়ে কাঁদি। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, কাঁদব না? কাঁদবার জন্যেই তো জন্ম।

# ৭ কার্তিক।

শেষরাত্রি থেকে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আশ্বিনে ঝড়বৃষ্টি হয়, এবার কার্তিক মাসে হল। অকালের বাদল। আমার কপালে কী আছে জানি না।

দুযোগের জন্যে সকালে কলাবতী আসতে পারেনি। পিউ ঘুম ভেঙে হাঙ্গামা শুরু করেছিল, অতি কষ্টে ঠাণ্ডা করেছি। টিনের দুধ খেয়েছে; কিন্তু গাল ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ফোলাচ্ছে। কী যে করি ওকে নিয়ে!...

দুপুরবেলা পিউ ঘুমুলে ডায়েরি লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভাল লাগল না। বাইরে ঝড় থেমেছে, রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। মনটা উদাস হয়ে গেল। পিউয়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুম ভেঙে গেল শুক্লার গলার আওয়াজে। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে,–আসুন আসুন—কেমন আছেন?

তারপরই মোটা গলার আওয়াজ,—প্রিয়দম্বা কোথায়? পিউ কোথায়?

আমার শরীর নিথর হয়ে গেল; তারপর থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করল। কিছুতেই কাঁপুনি থামাতে পারি না; যেন ম্যালেরিয়ার জ্বর আসছে। পিউ আগেই জেগে উঠেছিল,

বিছানায় বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছিল। সে ঘাড় হেলিয়ে শুনছে, বাপের গলা চিনতে পেরেছে।

শুক্লা ছুটে ঘরে ঢুকল, আমার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, এই প্রিয়া, শিগগির ওঠ। শঙ্খনাথবাবু এসেছেন। বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

দশ মিনিট পরে আমি যখন পিউকে কোলে নিয়ে বাইরের ঘরে গেলুম তখন শরীরের কাঁপুনি থেমেছে, মনও শক্ত করেছি। কিছুতেই হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা হবে না, সহজভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষ যেমন কথা বলে তেমনই কথা বলব।

তবু তাঁকে দেখে বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। রোগা হয়ে গেছেন, চোখের কোলে কালি; আগুনে-ঝলসানো চেহারা। বসে ছিলেন, আমাদের দেখে উঠে এসে পিউয়ের দিকে হাত বাড়ালেন। পিউ একটু ইতস্তত করে তাঁর কোলে গেল, আবার তখনই আমার কোলে ফিরে এল। কারুর মুখে কথা নেই।

কলাবতীকে উনি সঙ্গে এনেছেন, সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল; এখন এগিয়ে এসে আমার কোল থেকে পিউকে নিয়ে চুপি চুপি বলল, চল পিউরানি, আমরা খেলা করি গিয়ে। আমাকে বলল, মাজী, পিউকে ফুটপাথে নিয়ে যাই? বিষ্টি থেমেছে।

যাও।

সে পিউকে নিয়ে চলে গেল।

শুক্লা গলা বাড়িয়ে বলল, চা করছি। শঙ্খনাথবাবু, চলে যাবেন না।

উনি গলার মধ্যে সম্মতিসূচক শব্দ করে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমি একটু দূরে বসলুম।

দুজনে চুপ করে বসে আছি। উনি কী ভাবছেন উনিই জানেন, আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। কী বলব? এরকম অবস্থায় মানুষ সহজভাবে কোন্ কথা বলে?

শেষ পর্যন্ত উনি প্রথম কথা কইলেন, আমার পানে চোখ না তুলেই বললেন, সলিলা মরে গেছে।

মরে গেছে। বিদ্যুতের মত সলিলার চেহারা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এত রূপ, এমন যৌবন—মরে গেছে। তাহলে উনি তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন! তাহলে—!

তারপর তিনি এলোমেলো কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কখনও দুটো কথা বলে চুপ করে বসে থাকেন, কখনও গড়গড় করে খুব খানিকটা কথা বলেন। গলার স্বর কখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়, আবার কিছুক্ষণের জন্যে জোরালো হয়ে ওঠে। আমি আচ্ছন্নের মত বসে আছি। শুনতে শুনতে কখন তাঁর কাছে গিয়ে বসেছি জানতে পারিনি। বাইরে বৃষ্টি

থেমেছে, পশ্চিমের আকাশে মেঘের গায়ে আলতাপাটি শিমের রঙ ধরেছে, ঘরের মধ্যে বেশী আলো নেই। আমি যেন ছেলেমানুষের মত বসে রোমাঞ্চকর গল্প শুনছি।–

শঙ্খনাথবাবু যখন জানতে পারলেন যে সলিলা লেফটেনেন্ট লজপৎ সিংয়ের সঙ্গে পালিয়েছে তখনই তিনি তার বাপ কর্নেল হরবংশ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হরবংশ সিংয়ের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, তাগড়া চেহারা, অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। শঙ্খনাথবাবু তাকে জিগ্যেস করলেন, লজপৎ সিং কোথায়?

হরবংশ সিং শঙ্খনাথবাবুকে চিনত, আগে দু-একবার দেখেছে; কিন্তু এখন চিনতে পারল না। বলল, হু আর ইউ? কী চাও?

শঙ্খনাথবাবু বললেন, তোমার ব্যাটা লজপৎ সিংকে চাই। কোথায় সে?

হরবংশ সিং চোখ রাঙিয়ে এগিয়ে এল, বলল, সে খবরে তোমার দরকার কী? মিলিটারি গুপ্ত কথা জানতে এসেছ? যাও—গেট আউট।

শঙ্খনাথবাবু তার গালে একটি চড় মারলেন। সে মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু চেঁচামেচি করল না। একটা অডার্লি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, বোধহয় লজপৎ সিংয়ের ব্যাপার জানত; সে ছুটে এসে শঙ্খনাথবাবুকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল, রাস্তায় বার করে দিয়ে খাটো গলায় বলল, বাবুজী, এখানে কি জন্যে এসেছ? দিল্লি যাও।

পরদিন সকালে পিউকে আমার কাছে রেখে সন্ধ্যের গাড়িতে তিনি দিল্লি যাত্রা করলেন। প্লেনে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্লেনের টিকিট পেলেন না।

ট্রেনের কামরায় একটি বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনিও দিল্লি যাচ্ছেন। মিলিটারি অফিসার, মেজর হরিদাস মৈত্র। দিল্লীতে পোস্টেড, ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন, আবার কাজে জয়েন করতে যাচ্ছেন। কথায় কথায় শঙ্খনাথবাবু তাকে জিগ্যেস করলেন, লেফটেনেন্ট লজপৎ সিংকে তিনি চেনেন কি না! মেজর মৈত্র লজপৎ সিংকে চেনেন না, তার বাপ হরবংশ সিংয়ের নাম জানা থাকলেও পরিচয় নেই। আর্মিতে হাজার হাজর অফিসার আছে, কে কাকে চেনে?

পরদিন সন্ধ্যেবেলা নয়াদিল্লি স্টেশনে পৌঁছে শঙ্খনাথবাবু মেজর মৈত্রকে বললেন, আপনাদের মিলিটারি মহলে খোঁজ নিলে লজপৎ সিংয়ের খবর পাওয়া যাবে কি?

মেজর মৈত্র বললেন, আপনি এক কাজ করুন। আমার ঠিকানা দিচ্ছি, পরশু আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ইতিমধ্যে আমি খবর সংগ্রহ করে রাখব।

তিনি ঠিকানা দিয়ে চলে গেলেন। শঙ্খনাথবাবু একটা হোটেলে উঠলেন। সেই রাত্রেই তিনি অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। কাছেপিঠে কয়েকটি হোটেল ছিল, সেখানে খোঁজ নিলেন। পিস্তল তাঁর পকেটে আছে। কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে পেলেন না।

পরদিন সকাল থেকে রীতিমতো তল্লাশ শুরু হল। দিল্লিতে অসংখ্য হোটেলে; নয়াদিল্লির অশোক হোটেল থেকে পুরনো দিল্লির মোসাফিরখানা পর্যন্ত নানা হোটেল আছে। শঙ্খনাথবাবু পিস্তল পকেটে নিয়ে একটির পর একটি হোটেল তল্লাশ করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও আশাজনক কোনও খবর পেলেন না। একটা হোটেলে গিয়ে শুনলেন, এক জোড়া স্ত্রী পুরুষ কয়েকদিন থেকে সেখানে আছে; তারা বাইরে বেশী বেরোয় না, ঘরের মধ্যেই থাকে। তাদের ভাষা খুব পরিষ্কার নয়, বাঙালী কিংবা মাদ্রাজী হতে পারে। বর্ণনা শুনে শঙ্খনাথবাবুর সন্দেহ হল এরাই সলিলা আর লজপৎ সিং। তিনি ম্যানেজারের কাছ থেকে ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

তিনতলার ওপর ঘর। শঙ্খনাথবাবু এক হাতে পকেটের পিস্তল চেপে ধরে অন্য হাতে দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলে দাঁড়াল ড্রেসিং-গাউন পরা এক ছোকরা, তার পিছনে একটি তরুণী। সলিলা আর লজপৎ সিং নয়। দুজনেই বাঙালী; নতুন বিয়ে হয়েছে, রাজধানীতে মধুচন্দ্র যাপন করতে এসেছে। পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে, বাইরে বেরোয় না। শঙ্খনাথবাবু মাফ চেয়ে চলে আসছিলেন, কিন্তু তারা ছাড়ল না। অনেকদিন তারা বাঙালীর সঙ্গে কথা বলেনি; তারা শঙ্খনাথবাবুকে ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক গল্প করল, চা খাওয়াল। তারপর আবার আসবেন বলে ছেড়ে দিল।

সমস্ত দিন খোঁজাখুঁজির পর রাত্রি দশটার সময় শঙ্খনাথবাবু নিজের হোটেলে ফিরে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে ধোঁকা লাগল; ওরা যদি হোটেলে না উঠে থাকে? যদি কোনও বন্ধুর বাসায় উঠে থাকে? কিন্তু শঙ্খনাথবাবু সহজে হতাশ হবার লোক নন; তিনি প্রথমে দিল্লির সমস্ত হোটেল দেখবেন, এখনও অনেক হোটেল বাকী আছে। তারপর অন্য রাস্তা

ধরবেন। ভারতবর্ষ তোলপাড় করে ফেলবেন; যতক্ষণ পলাতকদের ধরতে না পারেন ততক্ষণ নিরস্ত হবেন না।–

শুক্লা এই সময় চা আর জলখাবার এনে টেবিলে রাখল; নিজেও বসল। শঙ্খনাথবাবু কিছুই লক্ষ্য করলেন না, আপন মনে ছাড়া-ছাড়া ভাবে গল্প বলে যেতে লাগলেন।

–পরদিন তিনি মেজর মৈত্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মেজর মৈত্র বললেন, হেড কোয়ার্টার থেকে খবর যোগাড় করেছি। লেফটেনেন্ট লজপৎ সিং কলকাতায় পোস্টেড ছিল, দশদিন আগে হঠাৎ কমিশনে রিজাইন করেছে। ওরা জলন্ধরের লোক। ইস্তফা দিয়ে হয়তো দেশে ফিরে গেছে।

আর কোনও খবর নেই?

না।

সেখান থেকে শঙ্খনাথবাবু অশোক হোটেলে গেলেন। বিরাট হোটেল। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হল না, কিন্তু ম্যানেজারের অসংখ্য সহকারীর মধ্যে একজন বাঙালী যুবক ছিল, শঙ্খনাথবাবু তাকে ধরলেন। বর্ণনা শুনে যুবক বলল, হপ্তাখানেক আগে এই রকম একটি দম্পতি এসেছিল। মহিলাটি অপূর্ব সুন্দরী; বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তারা দুরাত্রি ছিল, তারপর চলে গেছে।

কোথায় গেছে বলতে পারেন?

যুবক একটা বাঁধানো খাতা খুলে দেখলে, বলল, এই যে, মিস্টর অ্যান্ড মিসেস এল সিং। না, ঠিকানা রেখে যায়নি। কিন্তু–দাঁড়ান। যুবক খাতা বন্ধ করে খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইল, তারপর বলল, মনে পড়েছে। তারা বম্বেতে তাজমহল হোটেলে স্যুট রিজার্ভ করার জন্যে টেলিগ্রাম করেছিল।

সেই রাত্রেই শঙ্খনাথবাবু প্লেনে বোম্বাই যাত্রা করলেন।

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ তাজমহল হোটেলে পলাতকদের খোঁজ পাওয়া গেল। তারা এসে দুরাত্রি ছিল, তারপর চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না।

শঙ্খনাথবাবু একটা সূত্র পেয়েছিলেন, আবার তা হারিয়ে গেল।

বম্বেতে দুদিন খোঁজাখুঁজি করে আবার তিনি দিল্লি ফিরে গেলেন। সেখান থেকে জলন্ধর গেলেন, সেখান থেকে অমৃতসর পাতিয়ালা। কিন্তু কোথাও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

এইভাবে দুহপ্তা কেটে গেল। একদিন শঙ্খনাথবাবুর কী মনে হল, তিনি আগ্রা গেলেন। আগ্রায় তাজমহল দেখলেন, হোটেলগুলোতে অনুসন্ধান করলেন, আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুর

সিক্রিতে ঘুরে বেড়ালেন; কিন্তু কোনই ফল হল না। ওরা যদি এখানে এসেও থাকে, তিনি আসবার আগেই। পালিয়েছে। কোথাও তারা দুরাত্রির বেশী থাকে না।

পরদিন সকালে তিনি স্টেশনে গেলেন, এখান থেকে মথুরা যাবেন। ওদের অবশ্য তীর্থস্থানে। যাওয়ার সম্ভাবনা কম; কিন্তু তীর্থস্থানে নিত্য অচেনা লোকের ভিড় লেগে থাকে, সেখানে লুকিয়ে থাকার সুবিধে আছে।

তিনি টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। কিন্তু তাঁকে মথুরা যেতে হল না, আগ্রার রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মেই তিনি সলিলার দেখা পেলেন।

তখনও ট্রেন আসেনি, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে বেশ একটু উত্তেজনা। যাত্রীরা, কুলিরা, এমনকী স্টেশনের কর্মচারীরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পুবদিকে যেখানে রেলের লাইন দূরে চলে গেছে সেই দিকে তাকিয়ে জল্পনা কল্পনা করছে। শঙ্খনাথবাবু একজন টিকিট চেকারকে জিগ্যেস করলেন, সে বলল, স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটি স্ত্রীলোকের লাশ পাওয়া গেছে, তাকেই আনা হচ্ছে। মনে হয় রাত্রে সিক্স আপ গাড়ি আগ্রা ছাড়ার পর কেউ তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে। রাত্রে জানা যায়নি, সকালে গুমটি থেকে খবর এসেছে।

একটা ট্রলি আসছে দেখা গেল। ক্রমে ট্রলি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। তার ওপর শুয়ে আছে সলিলার দেহ। মুখখানা আশ্চর্য রকম অবিকৃত, কিন্তু দেহ চূর্ণ হয়ে গেছে। সিল্কের শাড়ি রক্তে মাখামাখি, গায়ে একটিও গয়না নেই।

ব্যাপার অনুমান করা শক্ত নয়। লজপৎ সিং সলিলাকে নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, প্রেমের নেশাও ছুটে গিয়েছিল। কাল দুপুর-রাত্রে তারা আগ্রা স্টেশনে ট্রেনে উঠেছিল, তারপর লজপৎ সিং সলিলার গায়ের গয়না কেড়ে নিয়ে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

শঙ্খনাথবাবু কাউকে কিছু বললেন না, লাশ সনাক্ত করলেন না। মথুরার টিকিট বদল করে কলকাতার টিকিট কিনে বাড়ি ফিরে এলেন। লজপৎ সিং সম্বন্ধে তাঁর মন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছে। সে মরুক বাঁচুক এখন আর কিছু আসে-যায় না।

গল্প শেষ হবার পর আমরা কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইলুম। তারপর শুক্লা উঠে পেয়ালায় চা ঢেলে ওঁর হাতে দিল। তিনি পেয়ালা নিয়ে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর এক চুমুকে পেয়ালা শেষ করে টেবিলের ওপর রাখলেন। শুক্লা মৃদুস্বরে বলল, একটু কিছু মুখে দেবেন না।

না। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন; এমন ভাবে চারদিকে তাকালেন, যেন কোথায় আছেন ঠাহর করতে পারছেন না।

শুক্লা তাঁর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ ছলছল করছে, সে গাঢ় স্বরে বলল, শঙ্খনাথবাবু, যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। আমরা আপনাকে নিতান্ত

আপন জন মনে করি তাই। বলতে সাহস করছি। জীবনে অনেক দুঃখ শোক আসে, তাই বলে ভেঙে পড়লে তো চলবে না।

উনি বললেন, কে ভেঙে পড়েছে। আমি। আমি? বলে একটা শুকনো কঠিন হাসি হাসলেন।

শুক্লা বলল, কোনও দুঃখই স্থায়ী নয়, অতিবড় শোকও মানুষ ভুলে যায়। সংসার ছাড়া তো আমাদের গতি নেই, তাই ভুলতেই হবে। আপনিও সেই চেষ্টা করুন। অতীতকে ভুলে গিয়ে আবার সংসারের দিকে মন ফিরিয়ে আনুন। আপনার কতই বা বয়স

তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, আবার সংসার! কী বলছ তুমি? আর না—আর না। মেয়েমানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আমার জন্মের মত চুকে গেছে।

শুক্লা থতমত হয়ে বলল, কিন্তু পিউয়ের কথাও তত ভাবতে হবে।

পিউ। তিনি চারদিকে চাইলেন,—পিউ কোথায়? তাকে নিয়ে যাব।

এই সময় কলাবতী পিউকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কান্নায় আমার গলা বুজে এসেছিল। বুকের মধ্যে ঝড় বইছিল। আমি ছুটে গিয়ে পিউকে কোলে নিলুম, তাকে বুকে চেপে বললুম, না, আমি পিউকে যেতে দেব না। এই বলে পিউকে নিয়ে নিজের চলে এলুম।

বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলুম। পিউও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, সে চুপটি করে শুয়ে রইল।

খানিক পরে চোখ মুছে দেখি উনি বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখাচোখি হতেই বললেন, প্রিয়দম্বা, তুমি আমার উপর রাগ করেছ? তাঁর কণ্ঠস্বর বড় করুণ, দীনতারা।

পিউকে জড়িয়ে ধরে বললুম, না, পিউকে আমি দেব না।

পিউ তোমার কাছেই থাক। কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না। এই বলে খুব আস্তে আস্তে আমার গায়ে হাত রাখলেন।

আমার সমস্ত শরীর শিউরে কেঁপে উঠল। আমি আবার বালিশে মাথা গুঁজে আর্তস্বরে বললুম, না, না, আমাকে ছুঁয়ো না। তুমি যাও তুমি চলে যাও।

তাঁর হাত আমার কাঁধের ওপর থেকে সরে গেল। কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছে মুখ তুললুম, দেখি উনি নিঃশব্দে চলে গেছেন।

শুক্লা ঘরে ঢুকল। যেন কিছুই হয়নি এমনই সহজ সুরে বলল, শঙ্খনাথবাবু কলাবতীকে নিয়ে চলে গেলেন। রাত হয়ে গেছে, এবার ওঠ। পিউকে খাওয়াতে হবে না?

পিউ আজ বোতলের দুধ খেতে কোনও হাঙ্গামা করল না। তাকে খাইয়ে আবার বিছানায় শুলুম। শুক্লাকে বললুম, আমি আজ কিছু খাব না। খিদে নেই।

শুক্লা মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, উনি কি রাগ করে চলে গেলেন?

না—হ্যাঁ—ওই একরকম— বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল।

পিউ সহজে ঘুমুল না; তারও বোধহয় ঘুম চটে গেছে। পিটপিট করে তাকিয়ে রইল। আমি তখন তার কানে কানে বললুম, তোর বাবাটা যাচ্ছেতাই, না পিউ?

পিউ মুখ গম্ভীর করে বলল, হুঁ।

তোকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি দিইনি, তাই আমাকে বকেছে, মেরেছে।

পিউ চোখ গোল করে বলল, মেনেছে।

হ্যাঁ, মেরেছেই তো। মারা আর কাকে বলে? আয় এবার ঘুমুই।

কিছুক্ষণের মধ্যে পিউ ঘুমিয়ে পড়ল। আমি সারারাত চোখ চেয়ে জেগে রইলুম। জেগে জেগে একসময় মনে হল, পিউ যে মাতৃহীনা হয়েছে একথা কারুর খেয়াল হয়নি। মা-হারা মেয়ে বলে কেউ তার জন্যে দুঃখ করবে না।

# ২৩ কার্তিক

কার্তিক মাস ফুরিয়ে এল। একটু একটু শীতের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে; ভোরাত্রে গায়ে চাদর দিতে হয়।

উনি সেই যে চলে গিয়েছিলেন, আর সাড়াশব্দ নেই। নিশ্চয় রাগ করে আছেন। আমি না-হয় কেউ নয়, আমার ওপর রাগ করতে পারেন। কিন্তু মেয়ে তো নিজের, তার খোঁজ কি একবার নিতে নেই? আমি আর পারি না বাপু। ইচ্ছে করে পিউকে ফেরত দিয়ে আসি, বলি, এই নাও তোমার মেয়ে, আমাকে রেহাই দাও। মেয়েমানুষের সঙ্গে যখন সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ তখন নিজের মেয়ে নিজে মানুষ কর। আমার কিসের দায়?

শুক্লাও যেন আজকাল কেমন একরকম হয়ে গেছে। বেচারীকে দোষ দেওয়া যায় না। একদিকে নিজের কাজ, অন্যদিকে জামাইবাবুর সংসার। সে রোজ সকালে গিয়ে বাড়ি তদারক করে আসে, জামাইবাবুর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। তার ওপর গিন্নী ঠাকরুনের ভাবনা। হাসপাতালে তাঁর মাঝে বেশ বাড়াবাড়ি হয়েছিল, রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে আবার একটা আক্রমণ হব-হব হয়েছিল; কিন্তু সামলে গেছেন। কী দরকার ছিল সামলাবার তা জানি না।

শুক্লা হঠাৎ কিছু না বলে কয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, কী করে, কিছুই জানতে পারি না। জিগ্যেস করলে ভাসা-ভাসা উত্তর দেয়। মাঝে মাঝে জামাইবাবুর বাড়ি

থেকে ফিরতে দেরি করে। প্রশ্ন করি, এত দেরি যে! সে বললে, শশী ঝিকে নিয়ে বড় মুশকিল হয়েছে। রোজ বাড়ি থেকে জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে। কি যে করি। আমি বলি বিয়ে করে ফে। সে জবাব দেয় না, হাসেও না; হতাশ চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এইভাবে দিন কাটছে। সংসারে এত জ্বালা তবু সংসারের জন্যে আমরা পাগল। দুর ছাই, কিছু ভাল লাগে না। আজ যোল দিন পরে ওঁর গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম—কে, প্রিয়দম্বা! কেমন আছ?

বুজে-যাওয়া গলায় কোনমতে বললুম, ভাল।

তোমার মেয়ে কেমন আছে?

আমার মেয়ে!

মানে—পিউ কেমন আছে?

ভাল।

বেশ বেশ। শুক্লা আছে? তাকে একবার ডেকে দাও।

শুক্লার হাতে ফোন দিয়ে আমি সরে বসলুম। কী ব্যাপার!...শুক্লা বেশী কথা বলছে না, হাঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবছি—তোমার মেয়ে কেমন আছে মানে কী? ঠাট্টা? আমি পিউকে যেতে দিইনি তাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ? তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কী দরকার? জোর করে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গেলেই পারেন। ওঁর গায়ে যথেষ্ট জোর আছে, পকেটে পিস্তল আছে। তবে ভয়টা কিসের?...কিন্তু শুক্লার সঙ্গে এত মনের কথা কেন!

আচ্ছা আসি বলে শুক্লা ফোন রেখে দিল, আমার পাশে এসে বসল। আমি আগ্রহ দেখালুম না, তখন সে নিজেই বলল, শঙ্খনাথবাবু আজ বিকেলে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। পিউয়েরও নেমন্তন্ন।

চমকে উঠলুম,—হঠাৎ-কী মতলব?

সে বলল, মতলব আবার কী? উনি নেকড়ে বাঘও নয়, অজগর সাপও নয়; তা তো তুই জানিস। তোর জামাইবাবুকেও নেমন্তন্ন করেছেন।

কিন্তু হঠাৎ নেমন্তন্ন কেন?

তা কী জানি! আমরা একদিন ওঁকে খাইয়েছিলুম, হয়তো তারই জবাব দিচ্ছেন।

আমি যাব না।

শুক্লা ভুরু তুলে আমার পানে তাকাল,—যাবি না।

না। তোকে নেমন্তন্ন করেছেন তুই যা। আমি যখন ফোন ধরেছিলুম তখন আমাকে তো কিছু বলেননি। আমি যাব কেন?

তোর কি হিংসে হচ্ছে নাকি?

চোখ ফেটে জল এল। বললুম, তোকে হিংসে হচ্ছে না। কিন্তু ও কেন আমাকে কিছু বলল না? আমি যাব না।

এবার শুক্লা রেগে উঠল, কঠিন সুরে বলল, দেখ প্রিয়া, তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস। ভগবানের দান হাত পেতে না নিলে ভগবান হাত গুটিয়ে নেবেন। তখন সারাজন্ম ধরে কাঁদলেও আর পাবি না। মনে রাখিস।

আমি কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরলুম, বললুম, শুক্লা, আমার মাথার ঠিক নেই। তুই তো সব বুঝিস। আমি যাব। তুই যা বলবি তাই করব।

—আজ এইখানেই ডায়েরি লেখা শেষ করি। দুপুরবেলা পিউ ঘুমিয়েছে, আমি সেই ফাঁকে ডায়েরি লিখছি। কিন্তু মনটা ভারি ছটফট করছে।

বিকেলে পাঁচটার সময় আমরা বেরুব। কী জামা কাপড় পরব তাই ভাবছি। পিউকে গরম জামা পরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজ আবার মেঘ করছে, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

# ২৪ কার্তিক।

বুকের মধ্যে অনাহত মৃদঙ্গ বাজছে। কী করে লিখব?

যখন প্রথম ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেছিলুম তখন কে জানত আমার বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন জীবন এমন রঙে রসে ভরে উঠবে! মাত্র তিন মাস কেটেছে, এরই মধ্যে সব বদলে গেল। যেন বিশ্বাস হয় না।

আমার জীবনের দৃশ্যকাব্য বেশ তোড়জোড় করে আরম্ভ হয়েছিল, তারপর হঠাৎ যেন ঝপ করে শেষ হয়ে গেল। কিংবা এইটে হয়তো শেষ নয়, নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়ল। এর পর আরও অনেক আছে; অনেক দুঃখ সুখ, কান্না হাসি–

আজ আমার শেষ ডায়েরি লেখা, আর লিখব না। যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলুম তখন মনের আশ্রয় ছিল না; নিজের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু এখন আর আমার সময় নেই; একদিকে পিউ, অন্যদিকে একটি চাষা মনিষ্যি।...ভাবছি ডায়েরির এই পাতাগুলো যদি কোনও প্রবীণ লেখককে পাঠিয়ে দিই, কেমন হয়? তিনি হয়তো পড়বেন না, ফেলে দেবেন। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি পড়েন! যদি পড়ে তাঁর ভাল লাগে–?

.

পাঁচটার সময় ট্যাক্সিতে চড়ে বেরুলুম। পিউকে পশমের জামা পশমের টুপি পরিয়ে নিয়েছি। যেরকম ভিজে ভিজে হাওয়া বইছে, বৃষ্টি নামল বলে।

শুক্লা বেশ সাজগোজ করেছে। পুজোর সময় যে মেহদী রঙের মাদ্রাজী সিল্কের শাড়িটা কিনেছিল সেইটে পরেছে। এই রঙের শাড়িতে ওকে খুব মানায়। আমার কিন্তু সাজগোজ করা হল না, পিউকে সাজাতে সাজাতেই দেরি হয়ে গেল। কী বা হবে সাজগোজ করে। একটা ফিকে নীল রঙের পুরনো জর্জেটের শাড়ি পরেছি। চুলগুলো এলোখোঁপা করে জড়িয়ে নিয়েছি। এই যথেষ্ট।

আমি সাজগোজ করিনি দেখে শুক্লা মুখ টিপে হেসেছে, কিছু বলেনি। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বললুম, শুক্লা, ওঁর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে, সত্যি কিনা বল্। মিথ্যে বললে অনন্ত নরকে পচে মরবি।

সে বলল, মিথ্যে বলব কেন্ দুঃখে! হয়েছে দেখা।

কেন? তোর সঙ্গে ওঁর কী দরকার?

বলব না।

আমার হিংসে হচ্ছে কিন্তু।

তুই থাম্। সত্যি হিংসে হলে মুখ ফুটে বলতে পারতিস না।

কেন পারব না! ও নাহয় আমাকে চায় না, তাই বলে হিংসে হবে না!

শুক্লা জবাব দিল না, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। সন্দেহ হল সে হাসছে।

ট্যাক্সি গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। গাড়িবারান্দার সামনে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, একপাশে কলাবতী অন্য পাশে শিউসেবক। শিউসেবক গাড়ির দরজা খুলে দিতেই কলাবতী পিউকে ছোঁ মেরে নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

উনি বললেন, এস, অন্য অতিথিরা এখনও আসেননি।

আমার দিকে একবার তাকালেন; যেন একটু অপ্রস্তুত ভাব। তারপর আমাদের ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ওঁর চেহারা অনেকটা ভাল, সেই আগুনে ঝলসানো ভাব আর নেই।

ড্রয়িংরুমের ভেতরে এর আগে আসিনি; ছবির মত সাজানো। আমি আর শুক্লা একটা সোফায় বসলুম। শুক্লা বলল, অন্য অতিথিরা কারা? একজন তো ডক্টর দাস–?

উনি বললেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি ডক্টর মন্মথ কর।

আমরা হকচকিয়ে তাকালুম। মন্মথ করকে আমাদের সঙ্গে নেমন্তন্ন করেছেন। এ কী কাণ্ড!

কিন্তু আর কোনও কথা হবার আগেই বাইরে জামাইবাবুর গাড়ির হর্ন শোনা গেল। উনি বাইরে গেলেন।

আমি আর শুক্লা মুখ-তাকাতাকি করলুম। দুজনের চোখে একই প্রশ্ন—মন্মথ করকে আবার কেন?

ওঁরা দুজনে কথা কইতে কইতে ঘরে এলেন। জামাইবাবুর ডাক্তারী পোশাক; আমাদের দেখে কৌতুক-ভরা হাসি হাসলেন, বললেন, আমি কিন্তু বেশীক্ষণ থাকব না, চা খেয়েই পালাব। হাসপাতালে কাজ আছে।

উনি বললেন, না ডাক্তারবাবু, আজ আপনাকে একটু থাকতে হবে। মন্মথ করকে ডেকেছি, আপনাদের সামনেই তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।

জামাইবাবুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তীক্ষ্ণ চোখে ওঁর পানে তাকিয়ে বললেন, মন্মথ কর! তার সঙ্গে কিসের বোঝাপড়া?

ওঁর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল,—আছে। পরশু মন্মথ কর এসেছিল। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, ওদের দুজনের নামে অকথ্য মিথ্যে কথা বলে গেছে।

আপনাকেও বাদ দেয়নি। আমি তখন কিছু বলিনি, কেবল শুনে গেছি। আজ তাকে আসতে বলেছি, আপনাদের তিনজনের সামনে ভাল করে শিক্ষা দেব।

আমরা কাঠ হয়ে বসে রইলুম। জামাইবাবুর কপালে ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছিল, আস্তে আস্তে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি একটু হেসে বললেন, মন্মথ কর যে সত্যি কথা বলেনি আপনি জানলেন কী করে? আমাদের আপনি কতটুকুই বা জানেন?

তিনি মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, জানি। আমার অন্তরাত্মা জানে, আপনারা খাঁটি মানুষ। আমি মানুষ চিনি। জীবনে মাত্র একবার মোহের নেশায় মানুষ চিনতে ভুল করেছিলুম, গিলটিকে সোনা মনে করেছিলুম। সে ভুল আর দ্বিতীয়বার করব না।

জামাইবাবু ওঁর একটু আছে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, শুক্লার সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ আপনি জানেন?

উনি উঁচু গলায় বললেন, জানি। শুক্লা নিজেই আমাকে সব বলেছে। আপনি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, ও আপনাকে বিয়ে করেনি। যেদিন ওর মুখে এই কথা শুনেছিলাম, ইচ্ছে হয়েছিল ওকে কাঁধে তুলে নাচি। ডাক্তারবাবু, আমি ভালবাসার কাঙাল, যখন সত্যিকার ভালবাসা। দেখতে পাই তখন আমার মাথা ঠিক থাকে না।

শুক্লার দিকে তাকিয়ে দেখলুম সে রুমালে ঠোঁট চেপে মুখ নিচু করে আছে। জামাইবাবু কিন্তু হেসে উঠলেন, বললেন, ভালই করেছেন ওকে কাঁধে তুলে নাচেননি, তাতে ওর

গুমর আরও বেড়ে যেত, হয়তো কোনদিনই আমাকে বিয়ে করত না। যাহোক, মন্মথ কর আমাদের অনিষ্ট করার চেষ্টা করেছে, কিছুটা কৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাকে মারধোর করবেন নাকি?

উনি চোয়ালের হাড় শক্ত করে বললেন, সেটা নির্ভর করবে তার ব্যবহারের ওপর।

জামাইবাবু একটি নিশ্বাস ফেলে আমার পাশে এসে বসলেন, আমার কানে কানে বললেন, সখি, দেখছ কী, একেবারে আস্ত গুণ্ডা।

মনে মনে বললুম, তা কি আমি জানি না। কিন্তু এমন গুণ্ডা পৃথিবীতে কটা আছে!

এই সময় বাইরে একটা ছোট গাড়ি এসে দাঁড়াল। উনি বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। আমার বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল।

জামাইবাবু বললেন, দেখ, মন্মথ করকে সিধে করা আমাদের কম্ম নয়। যেমন বুনো ওল তেমনই বাঘা তেঁতুল দরকার।

মন্মথ কর ওঁর সঙ্গে ঘরে ঢুকল, তারপর আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখ এক মুহূর্তে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

উনি বললেন, কী ডাক্তার, এদের চিনতে পার?

স্মার্ট ডাক্তার মন্মথ করের অবস্থা দেখে কষ্ট হয়; সে থতমত খেয়ে ঠোঁট চেটে বলল, আমি—দেখুন—আড়ালে আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই–

উনি আস্তিন গুটিয়ে হুঁঙ্কার ছাড়লেন, আড়ালে নয়, যা বলবে সকলের সামনে বল। কী বলবার আছে তোমার?

এক পা পেছিয়ে গিয়ে মন্মথ কর বলল, আমি—দেখুন—আমি তো নিজে কিছু দেখিনি, পাঁচজনের মুখে যা শুনেছি–। এসব যে মিথ্যে গুজব তা আমি কী করে জানব?

ওঁর ডান হাতটা মন্মথ করের কাঁধের ওপর পড়ল, আঙুলগুলো চিমটের মত তার শার্ক-স্কিনের কোট চেপে ধরল; বাঘের মত চাপা গর্জনে উনি বললেন, ডাক্তার, আজ তোমাকে ছেড়ে দিলাম। ফের যদি শুনতে পাই তুমি এদের কুৎসা করেছ, তোমার জিভ উপড়ে নেব। যাও। উনি তার কাঁধ ছেড়ে দিলেন, ডাক্তার টাউরি খেতে খেতে ঘর থেকে চলে গেল।

মন্মথ কর আমাকে কয়েকবার দুষ্ট মতলবে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিল, উনি কি শুক্লার মুখে তাই জানতে পেরে জবাব দিলেন? শুক্লা ওঁকে আমাদের জীবনের অনেক গোপন কথা বলেছে; কেন বলেছে জানি না, নিশ্চয় কোনও উদ্দেশ্য আছে। শুক্লা তো বাইরের লোকের কাছে ঘরের কথা বলার মেয়ে নয়।

মন্মথ করের গাড়ি চলে গেল, আওয়াজ পেলুম। আমার একপাশে শুক্লা অন্য পাশে জামাইবাবু। গৃহস্বামী দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কারুর মুখে কথা নেই। ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে।

উনি হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলেন, ঘরটা দপ করে হেসে উঠল। হঠাৎ যেন রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন হল।

শিউসেবক ঘরে ঢুকল; আমার পিছনে এসে একটু ঝুঁকে খাটো গলায় বলল, মাজী, চা আনি?

আমি চমকে ঘাড় ফেরালুম; শিউসেবক আমার পানেই সসম্ভ্রমে চেয়ে আছে। কিন্তু চা আনবে কি না একথা শিউসেবক আমাকে জিগ্যেস করছে কেন? কেমন যেন বোকা হয়ে গিয়ে বললুম, আন।

শিউসেবক চলে গেল। আমি জামাইবাবুর দিকে তাকালুম; তিনি ভালমানুষটির মত চুপ করে বসে আছেন, কিন্তু তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির আভাস লেগে আছে। শুক্লার দিকে চোখ ফেরালুম; পোড়ারমুখী দুষ্টুমিভরা চোখ আকাশপানে তুলে বসে আছে। বাড়ির কর্তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি চোখ ফিরিয়ে জানলার সামনের গিয়ে দাঁড়ালেন। এদের মনে কী আছে। বুঝতে পারছি না; বোধ হচ্ছে যেন সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে।

শিউসেবক এবং আর-একজন চাকর চা নিয়ে এল। চায়ের সঙ্গে ট্রে-ভরা দেশীবিলিতী খাবার; কচুরি সিঙাড়া কেক প্যাটি। চাকরেরা টেবিলের ওপর ট্রে সাজিয়ে রেখে চলে যাবার পর জামাইবাবু বললেন, আমাকে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। সখি, আমাকে চা ঢেলে দাও। এবং একটা কচুরি। বেশী কিছু খাব না।

আমি উঠে গিয়ে টি-পট থেকে চা ঢাললুম। গৃহস্বামী জানলার দিক থেকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ বললেন, সখী! সখী কে?

জামাইবাবু বললেন, প্রিয়ংবদাকে আমি সখী বলে ডাকি। আর শুক্লা বলে প্রিয়া।

উনি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন, হাসিমুখে একবার আমার পানে চেয়ে বললেন, তাই নাকি! আমি ওকে প্রিয়দম্বা বলি, কিন্তু নামটা বোধহয় ওর পছন্দ নয়। একদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। তাহলে আমি কি ওকে সখী বলে ডাকব? কিংবা প্রিয়া?

আমার কান গরম হয়ে উঠল। জামাইবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, নিজের মনের মত সবাই করুক নামকরণ, বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার খুড়া রামচরণ। প্রিয়দম্বা আমার তো খুব খারাপ লাগে না; মনে হয় যেন জগদম্বার মাসতুত বোন।

আমি দুজনকে চা দিলুম, তারপর নিজের আর শুক্লার চা নিয়ে শুক্লার পাশে গিয়ে বসলুম। চা খাওয়া চলতে লাগল। ওদিকে ওঁরা দুজনে কী সব গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করেছেন। শুক্লা বলল, খিদে পেয়ে গেছে রে! তোর পায়নি?

উঠে গিয়ে একটা প্লেটে খাবার ভরে নিয়ে এলুম, দুজনে খেতে লাগলুম। কলাবতী পিউকে কোলে নিয়ে দোরগড়ায় এসে দাঁড়াল; তার মুখে একান থেকে ওকান পর্যন্ত হাসি। বলল, পিউরানী খেতে চাইছে।

পিউ কলাবতীর কোল থেকে পিছলে নেমে পড়ল, আমার কাছে ছুটে এসে প্লেটের দিকে ছোট্ট আঙুল দেখিয়ে বলল, উই খাব।

ওকে ভারী জিনিস খেতে দিই না, কিন্তু আজ আর না বলতে ইচ্ছে হল না। বললুম, কী খাবে তুলে নাও।

পিউ সন্তর্পণে একটি প্যাটি তুলে নিয়ে আমার পানে তাকাল,—খাই?

বললুম, খাও।

পিউ তখন প্যাটিতে ছোট্ট কামড় দিয়ে ঘাড়-হেলিয়ে বলল, ভাল।

কলাবতী এতক্ষণ দাঁত বার করে আমার পানে তাকিয়ে ছিল, পিউ তার কছে ফিরে গেল। দুজনে ঘর থেকে চলে গেল। দোরের কাছ থেকে কলাবতী ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার দাঁত বার করল।

কী হয়েছে এদের? সবাই যেন আমার সম্বন্ধে একটা গুপ্ত কথা জানতে পেরেছে, কিন্তু বলছে না।

চা খাওয়া শেষ হল।

জামাইবাবু রুমালে মুখ মুছে বললেন, আমি তাহলে এবার—

উনি হাত তুলে বললেন, একটু বসুন ডাক্তারবাবু। আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকার আছে।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, ওঁর মুখে সেই অপ্রস্তুত-ভাব ফিরে এসেছে। উঠে দাঁড়ালেন, গলা ঝাড়া দিলেন, যেন বক্তৃতা দেবার উদ্যোগ করছেন। তারপর ধরাধরা গলায় বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনি ওর—মানে–প্রিয় প্রিয়ংবদার অভিভাবক। তাই আপনার কাছে—ইয়ে প্রস্তাব করছি, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।

আমার অবস্থা বলবার চেষ্টা করব না, চেষ্টা করলেও বলতে পারব না। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল তখন জামাইবাবু ওঁকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়াচ্ছেন; শুক্লা আমার একটা হাত চেপে ধরেছে। সে কানে কানে বলল, চল, ওপর যাই। আমার হাত ধরে টানতে টানতে সে দোরের দিকে চলল।

জামাইবাবু ডেকে বললেন, ও কী, চললে কোথায় সখি! প্রস্তাবের উত্তর দিয়ে যাও।

শুক্লা বলল, ও উত্তর দেবে কেন? শঙ্খনাথবাবু তো ওর কাছে প্রস্তাব করেননি। তবে আমি বলতে পারি, সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। আয় প্রিয়া। তুমি যেন পালিও না, আমরা এখনই আসছি।

ওপরে পিউয়ের নার্সারিতে কেউ নেই, কিন্তু আলো জ্বলছে। শুক্লা আমার গলা জড়িয়ে বলল, প্রিয়া! আর হিংসে হচ্ছে না তো?

শুক্লার কাঁধে মাথা রেখে একটু কাঁদলুম। মনটা হাল্কা হলে জিগ্যেস করলুম, তুই আমার কথা ওঁকে কী বলেছিস।

শুক্লা নিরীহভাবে বলল, কিচ্ছু তো বলিনি?

শুক্লা। সত্যি বল নইলে এমন চিমটি কাটব—

না না, বেশী কিছু বলিনি। শুধু বলেছিলুম, তুই মরে যাচ্ছিস। পুরুষমানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কি ওরা কিছু দেখতে পায়!

এমন চিমটি কেটেছি শুক্লাকে, অনেকদিন কালশিটে থাকবে।

নীচে নেমে এসে শুক্লা জামাইবাবুকে বলল, চল, তুমি আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। পিউ আর প্রিয়া পরে যাবে, শঙ্খনাথবাবু ওদের পৌঁছে দেবেন।

ওরা হাসতে হাসতে চলে গেল। আমার একটা নিশ্বাস পড়ল। এত প্রীতি, এত মমতা, এত দরদ ওদের প্রাণে! ভগবান কবে যে ওদের মুক্তি দেবেন।

ওরা চলে যাবার পর উনি ঘরের বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে ছোট আলো জ্বেলে দিলেন। গোলাপী প্রভায় ঘরটি স্বপ্নময় হয়ে উঠল।

আমি সোফার এক কোণে বসে ছিলুম, উনি আমার পাশে এসে বসলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমাকে কী বলে ডাকব আগে ঠিক হোক। প্রিয়া চলবে না?

আমার নিশ্বাস ঘন ঘন বইতে আরম্ভ করেছিল, যথাসাধ্য দমন করে বললুম, না।

তবে—প্রিয়া? সখী?

আমি আস্তে আস্তে বললুম, আমার মা-বাবা আমাকে বাদল বলে ডাকতেন।

বাদল। বাদল। তিনি নামটা কয়েকবার আবৃত্তি করে বললেন, এই তো খাসা নাম। আমিও আজ থেকে তোমাকে বাদল বলে ডাকব।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। আমার সারা গায়ে যেন উইপোকা চলে বেড়াচ্ছে। খোঁপাটা হঠাৎ খুলে গিয়ে পিঠে এলিয়ে পড়ল।

উনি বললেন, ও কী, তুমি কাঁপছ কেন? ভয় করছে?

বললুম না।

তবে?

চুপ করে রইলুম।

উনি হঠাৎ আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, প্রিয়দম্বা, তুমি আমাকে ভয় কোরো না। আমি বড় অসহায়। আমাকে তুমি নিজের হাতে তুলে নাও। সত্যি আমি চাষা মনিষ্যি, আমাকে তুমি সভ্য করে নাও, ভদ্র করে নাও। একটু স্নেহ একটু ভালবাসা—এর বেশী কিছু আমি চাই না। তাঁর গলা বুজে এল।

আমি কী উত্তর দেব? আমার কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। তারপর উনি হঠাৎ আরও ব্যগ্র স্বরে বলে উঠলেন, তুমি কোনওদিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না?

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না, ওঁর মুখখানা দুহাতে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললুম, তুমি ওসব কথা ভুলে যাও। আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেব–

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

দম্মা!

দোরের কাছ থেকে মিহি আওয়াজ পেয়ে দুজনেই মুখ তুললুম। পিউয়ের ছোট্ট চেহারাটি দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; বোধহয় কলাবতী তাকে দোরের কাছে নামিয়ে দিয়ে সরে গেছে। সে এদিক-ওদিক চেয়ে আমার কাছে এল; একবার বাপের দিকে তাকাল, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে বলল, ঘুম পাচ্ছে।

আমি পিউকে কোলে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। পিউ আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুবার উপক্রম করল।

উনি পাশে এসে দাঁড়ালেন, পিঠের ওপর দিয়ে আমাদের দুজনকে বাহু দিয়ে ঘিরে খুব আস্তে আস্তে বললেন, পিউ যেন কোনও দিন জানতে না পারে তুমি ওর মা নও।

না, পিউ জানতে পারবে না। পিউকে জানতে দেব না। কিন্তু—বুকের মধ্যে একবার মুচড়ে উঠল—পিউ কি আমার পেটে জন্মাতে পারত না? জন্মালে কী দোষ হত?

কিন্তু না, এই ভাল। পিউ আমার পেটে জন্মালে এত সুন্দর হত কি?...

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে–রিমঝিম রিমঝিম।